বজ্রশক্তি
সংকলন
রেজি: ডিএ ৬২৬৯, সংখ্যা-২৭
চৈত্র ১৪২৮ | এপ্রিল ২০২২ | শাবান ১৪৪৩
৩২ পৃষ্ঠা ১০ টাকা

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ
পৃথিবীকে কোন দিকে নিয়ে যাচ্ছে?

"স্বনির্ভর বাংলাদেশ গড়তে কৃষিবিপ্লব ঘটাতে হবে"
-হোসাইন মোহাম্মদ সেলিম

দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি রুখতে জাগতে হবে আপনাকেই

সম্পাদকীয়

সূচিপত্র

- *রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ পৃথিবীকে কোন দিকে নিয়ে যাচ্ছে?* ২
- *সওম (রোজা) কী, সওম কার জন্য?* ৯
- *তাদের একই অঙ্গে কত রূপ!* ১১
- *দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি রুখতে জাগতে হবে আপনাকেই* ১৪
- *প্রকৃত উম্মতে মোহাম্মদী আজ কোথায়?* ১৬
- *সেই রুদ্র আসিতেছেন!* ২০
- *কোর'আন খতম ও তারাবিকেন্দ্রিক ধর্মব্যবসা* ২৪
- *বাস্তব জীবনে রোজার কোনো প্রভাব পড়ছে কি?* ২৮
- *সাস্থ্যসম্মত ইফতার করুন প্রাণবন্ত থাকুন* ৩১

প্রকাশক ও সম্পাদক:
এস এম সামসুল হুদা
১৩৯/১, তেজকুনী পাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫ কর্তৃক মানিকগঞ্জ প্রেস, ৪৪ আরামবাগ, মতিঝিল, ঢাকা থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

উপদেষ্টামণ্ডলী:
মসীহ উর রহমান
উম্মুত তিজান মাখদুমা পন্নী
রুফায়দাহ পন্নী

প্রচ্ছদ ও লেআউট কম্পোজিশন:
হেলাল উদ্দিন

বার্তা ও বাণিজ্যিক কার্যালয়:
২২৩, মধ্য বাসাবো, সবুজবাগ, ঢাকা- ১২১৪
০২-৪৭২১৮১১১, ০১৭৭৮-২৭৬৭৯৪

বিজ্ঞাপন বিভাগ:
০১৬৩৪-২০৮০৩৯

ওয়েব:
www.bajroshakti.com
facebook.com/dailybajroshakti

ই-মেইল:
bajroshakti@gmail.com

যা থাকছে এবারের সংকলনে

ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের অন্যতম হচ্ছে সওম বা রোজা। ইসলাম একটি ভারসাম্যপূর্ণ জীবনবিধান। এতে মানুষের সামষ্টিক জীবনের যাবতীয় সমস্যার সমাধান যেমন দেওয়া হয়েছে তেমনি মানুষের আত্মিক ও আধ্যাত্মিক পরিশুদ্ধির ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে। মানুষ দেহ ও আত্মার সমন্বয়ে সৃষ্ট। আত্মার উপর যদি মানুষের নিয়ন্ত্রণ না থাকে তাহলে কাজের উপরও নিয়ন্ত্রণ থাকা সম্ভব নয়। আত্মনিয়ন্ত্রণের শিক্ষাই হচ্ছে সওমের শিক্ষা। সওম শব্দের অর্থ বিরত থাকা অর্থাৎ আত্মসংযম (Self Control)। মো'মেন সারাদিন সওম রাখবে অর্থাৎ পানাহার ও জৈবিক চাহিদাপূরণ থেকে নিজেকে বিরত রাখবে, আত্মাকে করবে শক্তিশালী। সে অপচয় করবে না, মিথ্যা বলবে না, পশুর মতো উদরপূর্তি করবে না। সে হবে নিয়ন্ত্রিত, ত্যাগী, নিজের জীবন ও সম্পদ উৎসর্গকারী এবং আল্লাহর হুকুম মানার ক্ষেত্রে সজাগ। তার এই চরিত্রের প্রতিফলন ঘটবে জাতীয়, সামাজিক ও সামষ্টিক জীবনে। ফলে এমন একটি সমাজ গড়ে উঠবে যেখানে সবাই একে অপরের জন্য ত্যাগ স্বীকার করতে উৎসাহী হবে। সেখানে বিরাজ করবে সহযোগিতা ও সহমর্মিতা।

কিন্তু বর্তমান সমাজে আমরা এর উল্টো চিত্রটি দেখতে পাই। রমজান আসলেই সমস্ত মুসলিম বিশ্বে হুলুস্থুল পড়ে যায়। ব্যাপক প্রস্তুতি চলতে থাকে ঘরে ঘরে। এত রোজা রাখার পরেও মানুষ এখানে আত্মকেন্দ্রিক এবং স্বার্থপর। তারা আল্লাহর হুকুম দিয়ে সমাজ পরিচালিত করে না। প্রতি বছর মুসলিম বিশ্বে সওম পালিত হচ্ছে, তারা নাকি খাদ্যগ্রহণ নিয়ন্ত্রণ করছেন। প্রশ্ন হলো, যদি নিয়ন্ত্রণই করে থাকেন তাহলে প্রতি বছর রমজান মাসে দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি কেন হয়? আমাদের সমাজে অন্যায় অবিচার অন্য মাসের মতোই চলমান থাকে কেন? সত্যমিথ্যা, ন্যায়-অন্যায়ের বোধ (তাকওয়া) যখন সৃষ্টি হচ্ছে না, তার অর্থ দাঁড়াচ্ছে আমাদের সওম হচ্ছে না। কারণ সওমের উদ্দেশ্যই হচ্ছে তাকওয়া সৃষ্টি (সুরা বাকারা ১৮৩)। সওম যে হবে না এ কথাটিই রসুলাল্লাহ (সা.) বলেছেন, এমন সময় আসবে যখন মানুষ সওম রাখবে কিন্তু সেটা না খেয়ে থাকা হবে।

এমনই নানা অসঙ্গতি ও প্রশ্নের জবাব খুঁজে পাওয়া যাবে এ সংকলনের প্রবন্ধগুলোতে।

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ পৃথিবীকে কোন দিকে নিয়ে যাচ্ছে?

মোহাম্মদ আসাদ আলী

রুশ বাহিনীর হামলায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে ইউক্রেনের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর খারকিভ। ছবি: রয়টার্স

বাংলাদেশে বসে আমি যখন এই লেখাটি লিখছি, তখন ৬ হাজার কিলোমিটার দূরে ইউক্রেনের মাটি কাঁপাচ্ছে রাশিয়ার আধুনিক অস্ত্রসজ্জিত সেনাবহর ও সাঁজোয়া যানগুলো। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ ইতোমধ্যেই বিশ্বরাজনীতিতে ঝড় তুলেছে। এই যুদ্ধের পরিণতি কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে, কত অংকে ঠেকবে মৃত্যুর সংখ্যা, কত মানুষ হারাবে ঘরবাড়ি ও রুটি-রুজি, সেটাই এখন বিশ্লেষকদের জল্পনা-কল্পনার বিষয় হয়ে উঠেছে। অনেকে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের আশঙ্কাও করছেন। কেনই বা করবেন না? ইতোমধ্যেই যে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের আলামত ফুটে উঠেছে! একদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন ন্যাটোভুক্ত দেশগুলো রাশিয়ার বিরুদ্ধে কড়া অবস্থান নিয়েছে, আরেকদিকে ধারণা করা হচ্ছে চীন, ভারত, পাকিস্তান, উত্তর কোরিয়া, ইরান, সিরিয়ার মতো দেশগুলো রাশিয়ার দিকে ঝুঁকে আছে। রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট যুদ্ধের শুরুতেই পরমাণু হামলার স্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়ে বলেছেন, কেউ যদি তার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় তাহলে এমন পরিণতি দেখবে যেই পরিণতি ইতিহাসে কেউ কখনও দেখেনি। এদিকে যুক্তরাষ্ট্র ইউক্রেনকে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান অব্যাহত রাখলেও সরাসরি রাশিয়ার বিরুদ্ধে সামরিক পদক্ষেপ নেওয়ার কথা ভাবতে পারছে না, কারণ এটা ইরাক বা আফগানিস্তান বা লিবিয়া বা সিরিয়া নয়, এটা হলো অধুনালুপ্ত সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রত্যাবর্তিত রূপ রাশিয়া, যারা স্নায়ুযুদ্ধের পর থেকে বিগত তিন দশকে নিজেদের শক্তি ও সামর্থ্যকে কেবল পুনরুদ্ধারই করে নি, বরং শক্তিপরীক্ষা দেওয়ার জন্য উন্মুখ হয়ে আছে। এখন আবার আমেরিকা-রাশিয়া "কেহ কারে নাহি ছাড়ে সমানে সমান" অবস্থা। রাশিয়ার সঙ্গে পশ্চিমারা যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লে সেটা আর সাধারণ যুদ্ধ থাকবে না, পরমাণু যুদ্ধে রূপান্তরিত হয়ে যাবে নিমেষেরই। শুরু হয়ে যাবে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ।

কিন্তু এই অবস্থাটা কীভাবে তৈরি হলো? রাশিয়া ও ইউক্রেন প্রতিবেশী দেশ দু'টি কেন মুখোমুখী দাঁড়িয়ে গেল? ভ্লাদিমির পুতিন কি জানতেন না তিনি ইউক্রেনে আক্রমণ করলে পশ্চিমা বিশ্ব সরাসরি সামরিক প্রতিরোধে হয়ত অংশ নিবে না, কিন্তু নিষেধাজ্ঞা অবশ্যই দিবে। রাশিয়ার অর্থনীতি ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা করবে। তারপরও ভ্লাদিমির পুতিন কেন এতবড় ঝুঁকি

নিলেন? এর উত্তর জানতে আমাদেরকে ফিরে তাকাতে হবে অতীতের দিকে।

• প্রথম বিশ্বযুদ্ধ

১৯১৪ সালে যেদিন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়, রাশিয়ায় তখন জার সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত। আজকের ইউক্রেন তখন জার সাম্রাজ্যের একটি রাজ্য। জারের অত্যাচার নিপীড়নের বিরুদ্ধে ফুঁসে উঠল রাশিয়ার সাধারণ মানুষ। সমাজতন্ত্রের আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে কৃষক শ্রমিক মেহনতী মানুষ রুশ বিপ্লবী লেনিনের নেতৃত্বে জার শাসকদের সিংহাসনে এমন ধাক্কা দিল, জারদের গদি উল্টে গেল। ওদিকে কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলছিল। যুদ্ধে অস্ট্রো-হাঙ্গেরি সাম্রাজ্য ও তুর্কি সাম্রাজ্য পরাজিত হওয়ায় এই দুই সাম্রাজ্যের অধীন রাজ্যগুলো স্বাধীনতা ঘোষণা করতে লাগল। এই দেখে জারশাসন থেকে মুক্তি পাওয়া ইউক্রেনীয়রাও স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখছিল, কিন্তু লেনিন ইউক্রেন দখল করে সমাজতান্ত্রিক মতবাদ প্রতিষ্ঠা করলেন। ইউক্রেন আবারও রাশিয়ার অন্তর্ভুক্ত হলো। ইউক্রেনীয়রা আর সে যাত্রায় স্বাধীনতার মুখ দেখল না।

• দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ২৩ বছর পর যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হলো- হিটলার নিজের কবর খুঁড়ল রাশিয়ায় আক্রমণের মাধ্যমে। রাশিয়ার সামরিক সক্ষমতা বুঝতে পারেনি হিটলার। শুধু হিটলারের আক্রমণ ঠেকিয়ে দিয়েই রাশিয়া ক্ষান্ত থাকল না, হিটলারকে পরাজিত করে ইউরোপের পূর্বাঞ্চলীয় দেশগুলো পর্যন্ত দখল করে নিল। এমনকি হিটলারের জার্মানিও অর্ধেক দখল করে নিল। রাশিয়ার দখলে তখন পূর্ব জার্মানসহ ইউরোপের বিশাল ভূখণ্ড! রাশিয়া তার দখলকৃত দেশগুলোতে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত করে নিল।

• এরপরেই মানবজাতি তাকিয়ে দেখল বিশ্ব দরবারে দুই বিশ্বশক্তির আবির্ভাব-

ক. পশ্চিম ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্র মিলে ইঙ্গ-মার্কিন জোট (এরা পুঁজিবাদী গণতন্ত্রে বিশ্বাসী)

খ. পূর্ব ইউরোপ ও রাশিয়াসহ সোভিয়েত ইউনিয়ন (এরা সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী)।

• স্নায়ুযুদ্ধ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ফ্যাসিবাদী হিটলারের পতনের পর দুইটি বিশ্বশক্তির (পুঁজিবাদী ব্লক ও সমাজতান্ত্রিক ব্লক) দ্বৈরথ আরম্ভ হলো, যা ইতিহাসে স্নায়ুযুদ্ধ বা শীতল যুদ্ধ নামে আখ্যায়িত হয়েছে। দুই শক্তির কাছেই তখন হাজার হাজার পরমাণু বোমা মজুদ ছিল। যুদ্ধ লাগলে উভয়ই ধ্বংস হবে- শুধু এই কারণে পশ্চিমা জোট ও সোভিয়েত ইউনিয়ন একে অপরকে আক্রমণ করা থেকে বিরত থাকলেও তাদের সামরিক ও অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা বিশ্বের বহু স্থানে ছোট বড় যুদ্ধের আগুনে ঘি ঢেলেছে। যেমন কোরিয়া যুদ্ধ, আফগান যুদ্ধ ইত্যাদি। এসব ছায়াযুদ্ধে ব্যবহৃত হয়েছে ভিন্ন দেশের ভূখণ্ড, মরেছে ভিন্ন দেশের মানুষ। কিন্তু মারণাস্ত্র, অর্থ ও প্রশিক্ষণ দিয়েছে এই দুই বিশ্বশক্তি। এই স্নায়ুযুদ্ধ চলেছে একটানা নব্বইয়ের দশক পর্যন্ত। এরপরই সমাজতন্ত্রের আকাশে কালো মেঘ জমা শুরু হয়। কৃষক শ্রমিক মেহনতী মানুষের মুক্তির কথা বলে সোভিয়েত ইউনিয়ন গঠিত হলেও, কথিত সমাজতান্ত্রিক মতবাদ সেই মুক্তি এনে দিতে ব্যর্থ হয়। উল্টো মানুষের সকল প্রকার স্বাধীনতা ও অধিকারকে পদদলিত করে মানুষকে শত-সহস্রবিধিনিষেধের যাঁতাকলে নিষ্পেষণ করতে থাকে। এরই পরিণামে ও পুঁজিবাদী ব্লকের ইন্ধনে ১৯৯০-১৯৯১ সালের মধ্যে পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলো সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে বেরিয়ে যেতে থাকে। এই সময় ১৫টি দেশ সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে স্বাধীনতা পায়। দেশগুলোর নাম- লিথুয়ানিয়া, জর্জিয়া, এস্তোনিয়া, কিরগিজস্তান, রাশিয়া, বেলারুশ, মলডোভা, আজারবাইজান, উজবেকিস্তান, লাটভিয়া, তাজিকিস্তান, আর্মেনিয়া, তুর্কমেনিস্তান, কাজাখস্তান এবং বর্তমানে যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউক্রেন।

• সোভিয়েতের পতন ও যুক্তরাষ্ট্রের বাজিমাত

সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যাবার পর সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত ১৫টি দেশ স্বভাবতই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে পুঁজিবাদী ব্লকে প্রবেশ করল এবং সারা বিশ্বে বাজিমাত করা আরম্ভ করল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। সদ্য স্বাধীন হওয়া দেশগুলোর অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের কাছে নতজানু হওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। ওই সময় এমনকি রাশিয়াও যুক্তরাষ্ট্রের মোড়লিপনা মেনে নেয় এবং বিশ্বে যুক্তরাষ্ট্রের একাধিপত্য কায়েম হয়। পূর্ব থেকে পশ্চিম, উত্তর থেকে দক্ষিণ, সর্বত্র যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে টেক্কা দিতে পারে এমন কোনো সামরিক শক্তি তখন ছিল না, অর্থনৈতিক শক্তিও ছিল না। এখানে বলে রাখা ভালো, ইউক্রেন সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে স্বাধীন হবার পর সোভিয়েত আমলের পরমাণু অস্ত্রের বড় অংশ কিন্তু ইউক্রেনে রয়ে যায়। পরমাণু অস্ত্রে বিশ্বের তৃতীয় শক্তিধর দেশ হয়ে ওঠে ইউক্রেন। এরকম পরমাণু শক্তিধর দেশের উপর মোড়লিপনা করা যায় না, তাই যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্ররা ইউক্রেনকে নিরস্ত্রীকরণের উদ্যোগ নেয়। বিনিময়ে

অর্থনৈতিক সহায়তা কিছু দেওয়া হয়, আর দেওয়া হয় গালভরা প্রতিশ্রুতি। যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, রাশিয়া ও ইউক্রেন একটি চুক্তি সম্পাদন করে, যা ইতিহাসে "বুদাপেস্ট মেমোরেন্ডাম" চুক্তি নামে পরিচিত। এই চুক্তির মাধ্যমে ইউক্রেনকে অভয় দেওয়া হয় যে, কখনই যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও রাশিয়া ইউক্রেনকে আক্রমণ করবে না।

• পশ্চিমা বিশ্বের নতুন মাথাব্যথা: রাশিয়া ও চীন

একবিংশ শতাব্দীর শুরুতেই ২০০০ সনে রাশিয়ার ক্ষমতায় আসেন ভ্লাদিমির পুতিন। এই রুশ নেতা বাহ্যিকভাবে পশ্চিমা নেতৃত্ব মেনে নিলেও রাশিয়ার সোভিয়েত যুগের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি ফিরিয়ে আনার সুপ্ত ইচ্ছা তার মধ্যে রয়েছে এমনটাই বিশ্লেষকদের ধারণা। তিনি পুনরায় সোভিয়েত যুগের মতো রাশিয়াকে শক্তিশালী করতে চান এবং একমেরু বিশ্বব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়ে রাশিয়া-চীন ইত্যাদি দেশের সমন্বয়ে দুই মেরুকেন্দ্রিক বিশ্বব্যবস্থা গঠন করতে চান। এটা অবশ্য রাশিয়া ও চীনকে করতেই হতো কারণ বিশ্বব্যবস্থার লাগাম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হাতে রেখে চীন-রাশিয়া খুব বেশি এগোতে পারবে না। চীন বা রাশিয়ার মতো কোনো শক্তি যুক্তরাষ্ট্রকে ছাড়িয়ে যাবার অবস্থা হলে অবশ্যই যুক্তরাষ্ট্র লাগাম ধরে টান দিবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

> ***বস্তুত রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে যে যুদ্ধটা চলছে, তার শুরুটা রাশিয়াও করেনি, ইউক্রেনও করেনি। যুদ্ধটা শুরু করেছে মূলত যুক্তরাষ্ট্র। এই যুদ্ধ তো হবারই কথা ছিল না। যুক্তরাষ্ট্রই ইউক্রেনকে টোপ দিয়ে রাশিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক নষ্ট করিয়েছে এবং নিরস্ত্রীকরণের পর বিগত বছরগুলোতে কোটি কোটি ডলারের অস্ত্র বিক্রি করেছে ইউক্রেনের কাছে, যা রাশিয়াকে প্রচণ্ড চাপের মধ্যে ফেলে দিয়ে যুদ্ধে জড়াতে বাধ্য করেছে বলে বিশ্লেষকরা মনে করছেন।***

ইতোমধ্যেই পশ্চিমারা রাশিয়া ও চীনকে শত্রু ভাবতে আরম্ভ করেছে এবং ভূরাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিকভাবে দেশ দু'টিকে ঘিরে ফেলার পরিকল্পনা নিয়ে সামনে এগুচ্ছে। এই ঘিরে ফেলা প্রকল্পের মধ্যে বারবার যে দু'টো সামরিক জোটের নাম আলোচনায় আসে তাহলো- কোয়াড (QUAD- Quadrilateral Security Dialogue) ও ন্যাটো (NATO- North Atlantic Treaty Organization)। কোয়াড হলো যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন প্রশান্ত মহাসাগরীয় জোট, যার মূল লক্ষ্য চীনকে ঘিরে ফেলা। আর ন্যাটো হলো পশ্চিম ইউরোপীয় জোট, যার মূল লক্ষ্য হলো রাশিয়াকে ঘিরে ফেলা। এই ন্যাটোতেই যোগ দিতে চাচ্ছিলেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদেমির জেলেনস্কি, যা রাশিয়াকে বিচলিত করে তুলেছে এবং ইউক্রেনের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক অবস্থান নিতে বাধ্য করেছে বলে অনেক বিশ্লেষক মনে করেন।

ন্যাটো প্রসঙ্গে এখানে বলে রাখা দরকার- ১৯৪৯ সালে পশ্চিম ইউরোপের পুঁজিবাদী দেশগুলোকে নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র ন্যাটো সামরিক জোট গঠন করেছিল মূলত সোভিয়েত ইউনিয়নের হুমকি মোকাবেলার জন্য। তাই সোভিয়েত ইউনিয়ন যতদিন ছিল, ন্যাটো জোট ততদিন প্রাসঙ্গিক ছিল। সেই হিসেবে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর ন্যাটোও বিলুপ্ত হওয়ার কথা। কিন্তু বিলুপ্ত হয়নি ন্যাটো। হয়েছে ঠিক তার উল্টো। দিনকে দিন ন্যাটোকে আরও বড় করা হয়েছে। ইউরোপের নতুন নতুন রাষ্ট্রকে সদস্যপদ দেওয়া হচ্ছে এবং দেওয়া হচ্ছে মূলত রাশিয়াকে ঘিরে ফেলার জন্য। ইউরোপে ন্যাটো এখন কার্যত রাশিয়াবিরোধী জোটে পরিণত হয়েছে। ন্যাটোর সম্প্রসারণ যে রাশিয়াকে লক্ষ্য করেই ঘটছে, তা ভ্লাদিমির পুতিনের টের না পাওয়ার কোনো কারণ নেই। এক পর্যায়ে তিনি যখন দেখলেন সীমান্তবর্তী ইউক্রেনকেও ন্যাটোতে যুক্ত করার পাঁয়তারা চলছে, তখনই তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন ইউক্রেন ইস্যুতে কোনো ছাড় না দেওয়ার। এমতাবস্থায় রাশিয়া ইউক্রেনের পশ্চিমপন্থী প্রশাসনকে আর ক্ষমতায় দেখতে চাইছে না। যুদ্ধের মাধ্যমে জেলেনস্কি সরকারকে উৎখাত করে রাশিয়া ইউক্রেনে রুশপন্থী পুতুল সরকার ক্ষমতায় বসাতে চায়। যেমনটা করেছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইরাক ও আফগানিস্তানে।

• যুক্তরাষ্ট্র কেন ইউক্রেনকে গাছে তুলে মই নিয়ে গেল?

বস্তুত রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে যে যুদ্ধটা চলছে, তার শুরুটা রাশিয়াও করেনি, ইউক্রেনও করেনি। যুদ্ধটা শুরু করেছে মূলত যুক্তরাষ্ট্র। এই যুদ্ধ তো হবারই কথা ছিল না। যুক্তরাষ্ট্রই ইউক্রেনকে টোপ দিয়ে রাশিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক নষ্ট করিয়েছে এবং নিরস্ত্রীকরণের পর বিগত বছরগুলোতে কোটি কোটি ডলারের অস্ত্র বিক্রি করেছে ইউক্রেনের কাছে, যা রাশিয়াকে প্রচণ্ড চাপের মধ্যে ফেলে দিয়ে যুদ্ধে জড়াতে বাধ্য করেছে বলে বিশ্লেষকরা মনে করছেন। ইউক্রেনকে রাশিয়ার বিরুদ্ধে ব্যবহার করলে ইউরোপে যুদ্ধ শুরু হবে তা যুক্তরাষ্ট্র ভালোভাবেই জানত। ২০০৮ সালে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বুশ যখন ঘোষণা করেন, ন্যাটোর সদস্যপদ

যুদ্ধ শুরুর মাত্র এক মাসের মধ্যে দশ মিলিয়ন মানুষ ইউক্রেনে তাদের বাড়িঘর ছেড়ে দেশের অন্যান্য অংশে বা এর সীমান্ত পেরিয়ে অন্যদেশে পালাতে বাধ্য হয়েছে, যার অর্ধেকেরও বেশি শিশু। তাদের বাবা-মা তাদের যুদ্ধ-পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করছেন, এবং পরবর্তীতে কী হবে তা বোঝানোর চেষ্টা করছেন।

পাওয়ার উপযুক্ত হয়ে উঠেছে ইউক্রেন ও জর্জিয়া, তখনই এই দেশ দু'টির নিরাপত্তা সঙ্কটের বীজ বোনা হয়েছে। ডোনাল্ড ট্রাম্প ২০১৭ সালে যখন ইউক্রেনে কোটি কোটি ডলারের অস্ত্র বিক্রি আরম্ভ করে, তখনও যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্লেষকরা আশঙ্কা করে বলেছিলেন- ইউক্রেনে অস্ত্র পাঠালে পুতিন মারাত্মকভাবে ক্ষুব্ধ হবে এবং ইউক্রেন অঞ্চলে সংঘাত আরম্ভ হবে। কিন্তু বিশ্লেষকদের সেই সতর্কবাণী প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প যেমন কর্ণপাত করেননি, তেমনি কর্ণপাত করেননি জো বাইডেনও। গত কয়েক বছরে যুক্তরাষ্ট্র দফায় দফায় ইউক্রেনের কাছে কোটি কোটি ডলারের অস্ত্র বিক্রি করেছে এবং যুদ্ধকে অনিবার্য করে তুলেছে।

যুদ্ধকে সাধারণ মানুষ যেভাবে দেখে, সাম্রাজ্যবাদী অস্ত্রব্যবসায়ী রাষ্ট্রগুলো কিন্তু সেভাবে দেখে না। সাধারণ মানুষ যুদ্ধের মধ্যে দেখতে পায় প্রচণ্ড অর্থনৈতিক ও মানবিক সঙ্কট, অস্ত্রব্যবসায়ীরা দেখতে পায় অস্ত্রব্যবসার রমরমা বাজার! ইউক্রেন যুদ্ধের ফলে আমাদের মতো দেশগুলোর অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতি শক্তিশালী হয়। কারণ- তাদের অর্থনীতি হলো 'যুদ্ধ অর্থনীতি'। তাদের প্রধান আয় ধান থেকেও আসে না, গম থেকেও আসে না। প্রধান আয় আসে সমরাস্ত্র থেকে। কোথাও যুদ্ধ হওয়া মানেই বিবদমান দেশগুলো তো বটেই, তার চারপাশের দেশগুলোতে নিরাপত্তা সঙ্কট তৈরি হয়! নতুন নতুন শত্রু সৃষ্টি হয়। নিরাপত্তার হুমকি সৃষ্টি হয়। আর সেই ভয় থেকেই প্রয়োজন পড়ে অস্ত্র আমদানির। আপনি ভয় না পেলে, আপনার এলাকায় সংঘাত না হলে তো আপনি অস্ত্র কিনবেন না। কবে আপনার এলাকায় যুদ্ধ হবে, কবে আপনি ভয়ে আতঙ্কে অস্ত্র কেনার প্রয়োজন মনে করবেন সেই আশায় কি অস্ত্রব্যবসায়ীরা তাদের অস্ত্র-কারখানায় তালা ঝুলিয়ে বসে থাকবে? না, প্রয়োজনে নিজেরাই ঝগড়া বাধিয়ে, উসকানি দিয়ে যুদ্ধের জন্ম দিবে এবং সেই যুদ্ধের ভয় দেখিয়ে সবার কাছে অস্ত্র বিক্রি করবে। ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু হবার পর অস্ত্রের বাজার তুঙ্গে!

> ***বলা বাহুল্য, যুদ্ধের আগে ও যুদ্ধ শুরু হবার পরও যুক্তরাষ্ট্রের অস্ত্র বিক্রি কিন্তু বন্ধ হয়নি। রুশ আগ্রাসনের মুলা ঝুলিয়ে আরও যেসব রাষ্ট্র তথাকথিত রাশিয়ান আগ্রাসনের মুখে আছে বলে মনে করা হচ্ছে, ওইসব দেশেও বিলিয়ন বিলিয়ন ডলারের অস্ত্র বিক্রির বাজার তৈরি করেছে যুক্তরাষ্ট্র। আবার এই যুদ্ধের মওকা কাজে লাগিয়ে রাশিয়ার উপর সর্বাত্মক নিষেধাজ্ঞা দেওয়ার ফলেও লাভবান হবে যুক্তরাষ্ট্রই। নিষেধাজ্ঞার ফলে রুশ মুদ্রা রুবলের দাম কমতে থাকবে, আর রুশ মুদ্রা রুবলের দাম কমা মানেই ডলারের দাম বেড়ে যাবে। যা ইতোমধ্যেই বেড়েছে।***

একটি শিশুকে নিয়ে রুশবাহিনীর ট্যাঙ্ক অতিক্রম করছেন এক ইউক্রেনিয়। ছবিটি ইউক্রেনের দশম বৃহত্তম শহর মারিউপুল থেকে তোলা। ছবি: রয়টার্স

একথা ঠিক যে, রাশিয়া-ইউক্রেন দ্বন্দ্ব আগে থেকেই ছিল। ২০১৪ সালে রাশিয়া ক্রিমিয়া দখল করে নেওয়ার পর সম্পর্ক আরও খারাপ হয়। কিন্তু ইউক্রেন রাশিয়ার মুখোমুখী দাঁড়িয়ে ইউরোপে একটা যুদ্ধ শুরু করার কথা ভাবেনি কখনই। বড়ভাই রাশিয়ার মোড়লিপনা মেনে নিয়েই ছোটভাই ইউক্রেন টিকে ছিল। ইউরোপও ইউক্রেনের মধ্য দিয়ে রাশিয়ার তেল-গ্যাস পেয়ে আসছিল। মাঝখানে ঢুকল যুক্তরাষ্ট্র। রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে চলমান অনাস্থা ও বিরোধের সুযোগ কাজে লাগিয়ে ইউক্রেনে অস্ত্র বিক্রি আরম্ভ করল! ন্যাটোতে যোগ দেওয়ার লোভ দেখাতে লাগলো। পাড়াতো ভাইয়ের আশ্বাস পেয়ে ইউক্রেন এবার ভাবলো সময় এসে গেছে নিজের বড় ভাইকে জব্দ করার। রাশিয়ার সঙ্গে ইউক্রেনের আচরণ পাল্টে গেল, ছোট ভাইয়ের মতো না থেকে রাশিয়ার অবাধ্য হতে লাগলো, যা রাশিয়াকে চিন্তায় ফেলে দিল। এরই মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র দফায় দফায় ইউক্রেনে অস্ত্র পাঠালে আর ন্যাটো বাহিনী ইউক্রেনে এসে সামরিক মহড়ায় অংশ নিলে রাশিয়া সেটাকে 'যুদ্ধের আহ্বান' বলে ধরে নিয়ে ঘরের শত্রু বিভীষণকে শায়েস্তা করার সিদ্ধান্ত নিল। তারই পরিণতি এই যুদ্ধ! প্রশ্ন হলো, যুক্তরাষ্ট্র ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদেমির জেলেনস্কিকে গাছে উঠিয়ে মই নিয়ে গেল কেন? পরিস্থিতির শিকার হয়ে, নাকি এমনটাই পূর্বপরিকল্পনা ছিল?

বলা বাহুল্য, যুদ্ধের আগে ও যুদ্ধ শুরু হবার পরও যুক্তরাষ্ট্রের অস্ত্র বিক্রি কিন্তু বন্ধ হয়নি। রুশ আগ্রাসনের মুলা ঝুলিয়ে আরও যেসব রাষ্ট্র তথাকথিত রাশিয়ান আগ্রাসনের মুখে আছে বলে মনে করা হচ্ছে, ওইসব দেশেও বিলিয়ন বিলিয়ন ডলারের অস্ত্র বিক্রির বাজার তৈরি করেছে যুক্তরাষ্ট্র। আবার এই যুদ্ধের মওকা কাজে লাগিয়ে রাশিয়ার উপর সর্বাত্মক নিষেধাজ্ঞা দেওয়ার ফলেও লাভবান হবে যুক্তরাষ্ট্রই। নিষেধাজ্ঞার ফলে রুশ মুদ্রা রুবলের দাম কমতে থাকবে, আর রুশ মুদ্রা রুবলের দাম কমা মানেই ডলারের দাম বেড়ে যাবে। যা ইতোমধ্যেই বেড়েছে। এদিকে রাশিয়ার উপর নিষেধাজ্ঞা থাকায় ইউরোপ রাশিয়া থেকে গ্যাস নিতে না পারলে যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপে গ্যাস সরবরাহ করেও লাভবান হবে। ক্ষতি যদি হয় তা হবে বড় ভাই রাশিয়ার ও ছোট ভাই ইউক্রেনের। মজার ব্যাপার হলো- অদূর ভবিষ্যতে কোনো চুক্তির মাধ্যমে যদি যুদ্ধ বন্ধ হয়, তাহলে ইউক্রেনের ধ্বংস হয়ে যাওয়া অবকাঠামো পুনর্নির্মাণেও হয়ত কাজ করতে দেখা যাবে মার্কিন ডেভেলপার কোম্পানিগুলোকেই। যেমনটা আমরা আফগানিস্তানে ঘটতে দেখেছি। সেখানেও লাভের ফসল ঘরে তুলবে সেই মার্কিনিরাই।

এবার হয়ত আমরা বুঝতে পারছি কেন রাশিয়ার সঙ্গে আমেরিকা যুদ্ধে জড়াতে চাইছে না, বা ইউক্রেনকে বাঁচাতে কেন আমেরিকা নিজের সৈন্য পাঠাতে চাইছে না। আসলে এটাকে যুক্তরাষ্ট্র কখনই যুদ্ধ হিসেবে

নেয়নি, স্রেফ ব্যবসা হিসেবে নিয়েছে। এই ব্যবসায় রাশিয়া ও ইউক্রেন যেমন লাভবান হতে পারেনি, তেমনি লাভবান হতে পারেনি ইউরোপের অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোও। এবারের ব্যবসার পুরো লভ্যাংশই ঘরে তুলছে যুক্তরাষ্ট্র। কিন্তু তা করতে গিয়ে বিশ্বকে শোচনীয় অবস্থার মুখে ফেলে দিয়েছে । বৈশ্বিক অর্থনীতিতে ডেকে এনেছে বিপর্যয়। রয়টার্সের এক প্রতিবেদনে জানা গেল- গম রপ্তানিতে বিশ্বের শীর্ষ দেশ হলো রাশিয়া, আর চতুর্থ দেশ ইউক্রেন। পাশাপাশি ভুট্টা রপ্তানিতেও ইউক্রেন বিশ্বে তৃতীয়। এখন ইউক্রেন যুদ্ধবিধ্বস্ত, আর রাশিয়ার বাণিজ্যব্যবস্থার দরজায় ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে নিষেধাজ্ঞার তালা। উৎপাদক রাষ্ট্রগুলোর এই বেহাল দশা ভোক্তা রাষ্ট্রগুলোকেও জড়িয়ে ফেলছে নানাবিধ সঙ্কটে! ইউক্রেন সংলগ্ন কৃষ্ণ সাগরে পণ্য পরিবহনে বিঘ্ন ঘটায় ইতোমধ্যেই তেলের দাম অতীতের সমস্ত রেকর্ড অতিক্রম করেছে এবং স্বভাবতই অন্যান্য পণ্য-সামগ্রির দামও ঊর্ধ্বমুখী! পৃথিবীর সব দেশেই দ্রব্যমূল্যের উপর ইউক্রেন যুদ্ধের সরাসরি প্রভাব পড়া আরম্ভ হয়েছে।

> *রাশিয়ার সঙ্গে বাংলাদেশের ১১০ কোটি ডলারের বাণিজ্য হয়ে থাকে প্রতি বছর। বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাতের অন্যতম ক্রেতাও রাশিয়া। সুতরাং চলমান সঙ্কট ও নিষেধাজ্ঞার প্রভাব এড়ানো বাংলাদেশের জন্য মোটেও সহজ হবে না। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির মূল মন্ত্র হচ্ছে- 'সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব, কারো সঙ্গে বৈরিতা নয়।' সুতরাং বাংলাদেশ সরকার চীন, রাশিয়া, ভারত, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য কারো সঙ্গেই শত্রুতার সম্পর্ক চায় না।*

• বাংলাদেশ কী শিক্ষা পাচ্ছে?

এখানে বাংলাদেশেরও রয়েছে কঠিন বোঝাপড়ার বিষয়! বহুবিধ কারণে বাংলাদেশ ইউরোপ আমেরিকার পাশাপাশি চীন ও রাশিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক তৈরির পথে বহুদূর এগিয়ে গেছে। রূপপুরে বাংলাদেশের একমাত্র পরমাণু বিদ্যুৎপ্রকল্পটিও নির্মিত হচ্ছে রাশিয়ার অর্থনৈতিক ও কারিগরি সহায়তায়। এখন রাশিয়ার উপর পশ্চিমা দেশগুলো নিষেধাজ্ঞা দেওয়ায় বাংলাদেশের এই মেগা প্রকল্পের উপর কোনো প্রভাব পড়বে কিনা তা নিয়ে আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। এছাড়া রাশিয়ার সঙ্গে বাংলাদেশের ১১০ কোটি ডলারের বাণিজ্য হয়ে থাকে প্রতি বছর। বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাতের অন্যতম ক্রেতাও রাশিয়া। সুতরাং চলমান সঙ্কট ও নিষেধাজ্ঞার প্রভাব এড়ানো বাংলাদেশের জন্য মোটেও সহজ হবে না। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির মূল মন্ত্র হচ্ছে- 'সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব, কারো সঙ্গে বৈরিতা নয়।' সুতরাং বাংলাদেশ সরকার চীন, রাশিয়া, ভারত, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য কারো সঙ্গেই শত্রুতার সম্পর্ক চায় না। সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব বজায় রাখার মাধ্যমে দ্রুত দেশের অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করতে চায়। কাজেই রাশিয়ার সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক থাকলেও বাংলাদেশ সরকার রাশিয়ার পক্ষ নিয়ে পশ্চিমাদের সঙ্গে দ্বন্দ্বে জড়াবে তেমনটা মনে হয় না। কিন্তু তারপরও একটা বিষয় বিবেচ্য যে, পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলো নতুন বৈশ্বিক মেরুকরণের ক্রান্তিকালে দাঁড়িয়ে বাংলাদেশের মতো ভূরাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রগুলোকে কিন্তু নিরপেক্ষ থাকতে দিবে না। পশ্চিমা-পক্ষে আরও সক্রিয় ভূমিকায় দেখতে চাইবে বাংলাদেশকে। দক্ষিণ এশিয়ায় চীনের সঙ্গে পশ্চিমাদের যে প্রতিযোগিতা চলছে, তা বাংলাদেশকে প্রতিকূল অবস্থায় ফেলতে পারে। মনে রাখতে হবে, পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদ হোক কিংবা চীনা সাম্রাজ্যবাদ হোক- উভয়েই একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ এবং উভয়েরই একহাতে থাকে অর্থের প্রলোভন, আরেক হাতে চাবুক। তাদের ঋণের শিকল হয়ত এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব, কিন্তু ষড়যন্ত্রের নীল নকশা কীভাবে এড়ানো যাবে তা গভীর ভাবনার দাবি রাখে। বিশেষ করে কোনো জাতি যদি ঐক্যবদ্ধ না থাকে। রাজনৈতিক, ধর্মীয় ইত্যাদি ইস্যুতে হানাহানি-কোন্দলে মেতে থাকে, তাহলে বৈদেশিক ষড়যন্ত্রের ফাঁদে ফেলে সেই জাতিকে ধরাশায়ী করা একদম সহজ হয়ে যায়।

আমরা অতীতে ইরাক যুদ্ধ দেখেছি, আফগানিস্তান যুদ্ধ দেখেছি। এখন ইউক্রেন যুদ্ধ দেখছি। এই যুদ্ধগুলোর পক্ষে-বিপক্ষে যেই থাকুক, কয়েকটি সাধারণ ঘটনা আমরা বারবার ঘটতে দেখি। এই ঘটনাগুলো বিশ্লেষণ করে শিক্ষা নেওয়া দরকার, প্রস্তুত থাকা দরকার সব ধরনের পরিস্থিতির জন্য। আমাদের দেশটি ভূরাজনৈতিকভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এখানে ১৬ কোটি মানুষ রয়েছে, যাদের সিংহভাগ আল্লাহ-রসুলকে বিশ্বাস করেন। এই দেশটাকে টার্গেট করে অতীতে সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তও কম হয়নি। আমরা জানি না বিশ্বপরিস্থিতি সামনে কোন দিকে যাচ্ছে। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামরিক ইত্যাদি সঙ্কট আমাদের দেশেও ধেয়ে আসতে পারে। অবাক হবার কিছু নেই। তার জন্য আমাদেরকে যে প্রস্তুতিগুলো এখনই গ্রহণ করা উচিত তাহলো-

১. আমাদেরকে ধরেই নিতে হবে এই বস্তুবাদী দাজ্জালীয় সভ্যতায় 'আইন, ন্যায়, নীতি' বলে কিছু নেই। স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের যে ধারণাটা প্রচারিত হয়, সেটাও ফাঁকা বুলি। আদতে পৃথিবীতে চলছে 'মাইট ইজ রাইট' এর শাসন। এখানে শক্তিমানই ঠিক করে দিচ্ছে ন্যায়-অন্যায়। কাজেই, কখনও আক্রান্ত হলে আমরা কোথাও ন্যায়বিচার পাবো তার নিশ্চয়তা নেই। ইউক্রেন আক্রান্ত হবার পর রাশিয়ার বিরুদ্ধে পশ্চিমারা তো নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে, কিন্তু ইরাক আগ্রাসনের জন্য যুক্তরাষ্ট্রকে কোনো নিষেধাজ্ঞা পেতে হয়নি। সুতরাং, এখানে কোনো আইনের উপর ভরসা করার সুযোগ নেই।

২. পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদীদের বন্ধুত্ব, ওয়াদা, প্রতিশ্রুতি ইত্যাদির উপর ভরসা করার কোনোই কারণ নেই। তাদেরকে বিশ্বাস করা যাবে না। তাদের কাছে একজন মানুষের চেয়ে একটা বুলেটের মূল্য অনেক বেশি। তাদের অস্ত্রব্যবসার বাজার বসানোর জন্য আমাদের দেশকে শ্মশানভূমি বানানোর আগে তারা দুইবার ভাববে না।

৩. ইউক্রেন যুদ্ধসহ সকল যুদ্ধেই একটা বিষয় বারবার দেখা গেছে- পেশাজীবী সেনাবাহিনী দিয়ে দেশ রক্ষা হয় না। দেশ রক্ষার জন্য পুরো জনগণকেই মাঠে নামতে হয়। ইউক্রেনের জনগণ চার কোটি। এই চার কোটির মধ্যে অর্ধেকও যদি রাস্তায় নেমে রাশিয়ার বাহিনীর মোকাবেলায় ইট পাথরও ছুড়ত রাশিয়ান বাহিনী ইউক্রেন ছাড়তে বাধ্য হতো। সাধারণ জনগণ সংগ্রামে নামলে বিশ্বের সুপার পাওয়ারকেও তল্পিতল্পা গুটিয়ে পালাতে হয় তার প্রমাণ ভিয়েতনাম যুদ্ধে পাওয়া গেছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধেও তার উদাহরণ আমরা পেয়েছি। কাজেই, আমাদের জাতিকেও দেশ রক্ষার জন্য, মাটি রক্ষার জন্য শারীরিক, মানসিক ও আত্মিকভাবে প্রস্তুত করে তুলতে হবে।

৪. ইউক্রেনে রাশিয়ার আগ্রাসনকে অনেকটাই সহজ করে দিয়েছে দেশটির জাতিগত বিভাজন ও অনৈক্য। দেশটির পূর্বাঞ্চলীয় এলাকার বহু মানুষ রাজনৈতিকভাবে ইউক্রেন সরকারকে সমর্থন করে না, বরং তারা জেলেনস্কি সরকারের পতন চায়। তারা বরং রাশিয়ার সঙ্গেই যুক্ত হতে চায়। এরকম রাজনৈতিক বিভাজন ও দ্বন্দ্ব-সংঘাতের চরম মূল্য দিতে হয়েছে সিরিয়াকেও। আমাদের বাংলাদেশেও রয়েছে রাজনীতির নামে শত্রুতা, বিদ্বেষ ও ঘৃণার চর্চা। এই বিভেদ-বিভাজনের ফাটল বন্ধ করতে হবে। পুরো জাতিকে ইস্পাতকঠিন ঐক্যবদ্ধ জাতিসত্ত্বা হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। তবেই বড় ধরনের সঙ্কট মোকাবেলা করা সম্ভব হবে।

৫. সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো একমাত্র ওইসব ভূখণ্ডেই প্রতিরোধের মুখে পড়ে, যেখানে জনগণের মধ্যে শক্তিশালী আদর্শিক চেতনা কার্যকর রয়েছে। হতে পারে তা ধর্মীয় আদর্শ বা অন্য কোনো মতাদর্শের চেতনা। আদর্শ ছাড়া জনগণ সংগ্রামী প্রেরণা লাভ করতে পারে না। তাই ১৬ কোটি মানুষকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামী বানানোর জন্য তাদের মধ্যে আদর্শের সঞ্চার করতে হবে। যেহেতু আমাদের জনগণ ধর্মভীরু। তাই ধর্মের প্রকৃত শিক্ষা দিয়ে তাদেরকে ন্যায় ও সত্যের পক্ষে ঐক্যবদ্ধ করা অসম্ভব কিছু নয়।

৬. সাম্রাজ্যবাদীরা বিশ্বব্যাংক, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা, আন্তর্জাতিক মুদ্রা বিনিময় সিস্টেম ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করে এবং কাউকে মাথা উঁচু করতে দেখলেই নতজানু করার জন্য সেই দেশকে অর্থনৈতিকভাবে হয়রানি শুরু করে। কাজেই মাথা উঁচু করে বাঁচার জন্য আমাদেরকে নিজস্ব অর্থনৈতিক নিরাপত্তার কথা ভাবতে হবে। সাম্রাজ্যবাদীদের তৈরি ও নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থার উপর ভরসা করে বসে থাকা যাবে না। আমাদেরকে অন্য কোনো রাষ্ট্রের উপর নির্ভরশীল থাকাই যাবে না। খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসা ইত্যাদি মৌলিক বিষয়গুলোতে আমাদের স্বয়ংসম্পূর্ণ হতেই হবে। অন্যের নুন খেলে তার গুণ না গেয়ে উপায় থাকে না। স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন না করা গেলে ঘনায়মান সংকটে আমাদেরকেও বাধ্য হয়ে কোনো এক পরাশক্তির লেজুড়বৃত্তি করতে হবে, তাদের কাছে দেশ বিক্রি করতে হবে।

লেখক: সহকারী সাহিত্য সম্পাদক, দৈনিক বজ্রশক্তি

সওম (রোজা) কী, সওম কার জন্য?

রিয়াদুল হাসান

ইসলামের যেমন একটা উদ্দেশ্য আছে, তেমনি ইসলামের সকল হুকুম আহকামেরও প্রত্যেকটার আলাদা আলাদা উদ্দেশ্য আছে। সত্যদীন, দীনুল হক অর্থাৎ ইসলাম আল্লাহ কেন দিলেন, কেতাব কেন নাযিল করলেন, নবী-রসুলদেরকে কেন পাঠালেন ইত্যাদি সমস্ত কিছুরই উদ্দেশ্য আছে। আসমান-জমিন, গ্রহ-নক্ষত্র কোনো কিছুই যেমন উদ্দেশ্যহীনভাবে মহান আল্লাহ সৃষ্টি করেননি তেমনি মানুষকেও একটা নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করেছেন। যে কোনো বিষয়ের উদ্দেশ্য জানাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যে কোনো আমল করার আগে কাজটি কেন করবো এই উদ্দেশ্য জানা প্রত্যেকের জন্য অত্যাবশ্যক। সঠিকভাবে উদ্দেশ্যটা জেনে নেওয়াই হলো আকিদা সঠিক হওয়া। সমস্ত আলেমরা একমত যে আকিদা সহীহ না হলে ঈমানের কোন মূল্য নেই। এই আকিদা হলো কোনো একটা বিষয় সম্বন্ধে সঠিক ও সম্যক ধারণা (Comprehensive Concept, Correct Idea)। ইসলামের একটা বুনিয়াদী বা ফরজ বিষয় হলো সওম বা রোজা। পূর্বের অন্যান্য ধর্মগুলোর মধ্যেও উপবাস ব্রত (Fasting) পালনের বিধান ছিল যা বর্তমানে সঠিকরূপে নেই। ইসলামের বেলাতেও একই ঘটনা ঘটেছে। কাজেই মো'মেনদেরকে অবশ্যই সওমের সঠিক আকিদা জানতে হবে। প্রথমত জানতে হবে সওম বা রোজা কার জন্য।

• সওম কার জন্য?

সওমের নির্দেশ এসেছে একটি মাত্র আয়াতে, সেটা হলো- "হে মো'মেনগণ! তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতের মতো তোমাদের উপরও সওম ফরদ করা হয়েছে, যাতে তোমরা তাকওয়ার অধিকারী হতে পার (সুরা বাকারা-১৮৩)।" পাঠকগণ খেয়াল করুন, সওমের নির্দেশনাটা কিন্তু মো'মেনদের জন্য, আয়াতটি শুরু হয়েছে 'হে মো'মেনগণ' সম্বোধন দিয়ে। আল্লাহ কিন্তু বলেননি যে হে মানবজাতি, হে বুদ্ধিমানগণ, হে মুসুল্লিগণ ইত্যাদি। তার মানে মো'মেনরা সওম পালন করবে। তাহলে মো'মেন কারা? আল্লাহ সুরা হুজরাতের ১৫তম আয়াতে বলেছেন, তারাই মো'মেন যারা আল্লাহ ও রাসুলের উপর ঈমান আনে, কোনো সন্দেহ পোষণ করে না এবং সম্পদ ও জীবন দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করে। তারাই সত্যনিষ্ঠ মো'মেন। এই সংজ্ঞা যে পূর্ণ করবে সে মো'মেন। আমরা সংজ্ঞায় ২টি বিষয় পেলাম। এক, আল্লাহ ও রাসুলের প্রতি ঈমান অর্থাৎ আল্লাহর সার্বভৌমত্ব। যে বিষয়ে আল্লাহ ও রসুলের কোনো হুকুম আছে সেখানে আর কারো হুকুম মানা যাবে না। এই কথার উপর সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত ও দণ্ডায়মান। তারপর আল্লাহর এই হুকুমকে এই পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠার জন্যে তিনি আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালাবেন। তিনি হবেন মো'মেন। তার জীবন সম্পদ মানবতার কল্যাণে তিনি উৎসর্গ করবেন। এই মো'মেনের জন্যই হলো সওম, সালাহ, হজ্ব সবকিছু।

> ***"হে মো'মেনগণ! তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতের মতো তোমাদের উপরও সওম ফরদ করা হয়েছে, যাতে তোমরা তাকওয়ার অধিকারী হতে পার (সুরা বাকারা-১৮৩)।" পাঠকগণ খেয়াল করুন, সওমের নির্দেশনাটা কিন্তু মো'মেনদের জন্য, আয়াতটি শুরু হয়েছে 'হে মো'মেনগণ' সম্বোধন দিয়ে। আল্লাহ কিন্তু বলেননি যে হে মানবজাতি, হে বুদ্ধিমানগণ, হে মুসুল্লিগণ ইত্যাদি। তার মানে মো'মেনরা সওম পালন করবে।***

ইসলামের বুনিয়াদ পাঁচটি যার প্রথমেই হচ্ছে তওহীদ অর্থাৎ কলেমা। তারপরে সালাহ, যাকাত, হজ্ব ও সর্বশেষ হচ্ছে সওম (আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা. থেকে বোখারী)। এখানে প্রথমটি হচ্ছে ঈমান আর বাকি সব আমল। যে ঈমান আনবে তার জন্য আমল। মানুষ জান্নাতে যাবে ঈমান দিয়ে, আমল দিয়ে তার জান্নাতের স্তর নির্ধারিত হবে অর্থাৎ কে কোন স্তরে থাকবে সেটা নির্ভর করবে তার আমলের উপর। এই জন্যই রসুল (সা.) বলেছেন, "যে বললো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ সেই জান্নাত যাবে (আবু যর গিফারি রা. থেকে বোখারী মুসলিম)। তাহলে এখানে পরিষ্কার দুইটা বিষয় - ঈমান ও আমল। সওম হলো আমল। আর মো'মেনের জন্য এই আমল দরকার। তাহলে বিষয়টি পরিষ্কার যে মো'মেন সওম রাখবে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কেন সওম রাখতে হবে, সওমের উদ্দেশ্য কী?

• মো'মেনের লক্ষ্য অর্জনে সওমের ভূমিকা

সওম (রোজা) শব্দের অর্থ বিরত থাকা অর্থাৎ আত্মসংযম (Self Control)। রমজান মাসে মো'মেন

সারাদিন সওম রাখবে অর্থাৎ পানাহার ও জৈবিক চাহিদাপূরণ থেকে নিজেকে বিরত রাখবে, আত্মাকে করবে শক্তিশালী। সে অপচয় করবে না, মিথ্যা বলবে না, পশুর মতো উদরপূর্তি করবে না। সে হবে নিয়ন্ত্রিত, ত্যাগী, নিজের জীবন ও সম্পদ উৎসর্গকারী এবং আল্লাহর হুকুম মানার ক্ষেত্রে সজাগ। নফসের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সে তার মনকে, আত্মাকে শক্তিশালী করবে। প্রশ্ন হতে পারে, মো'মেনের কেন মনের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা দরকার? এর উত্তর আল্লাহ দিয়েছেন- যেন তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পারো। (বাকারা ১৮৩)

তাকওয়া হলো সাবধানে, সতর্কতার সাথে, দেখে শুনে জীবনের পথ চলা। আল্লাহর হুকুম যেটা সেটা মানা, আর যেটা নিষেধ সেটা পরিহার করা। এটা করতে হলে প্রবৃত্তির উপর নিয়ন্ত্রণ থাকা আবশ্যক। যিনি তাকওয়া অবলম্বন করেন তিনি হলেন মোত্তাকী। আল্লাহর দৃষ্টিতে মো'মেনের মর্যাদার মাপকাঠি হচ্ছে এই তাকওয়া। যিনি প্রতিটি কাজে সত্য-মিথ্যা, ন্যায়-অন্যায়, বৈধ-অবৈধ, ধর্ম-অধর্ম ইত্যাদি বিচার বিবেচনা করেন এবং সত্য, ন্যায়, হক ও বৈধপথ অবলম্বন করেন তিনি হলেন মোত্তাকী। যিনি যত বেশি ন্যায়সঙ্গত ও বৈধপন্থা অবলম্বন করবেন তিনি তত বড় মোত্তাকী। সুতরাং সওমের উদ্দেশ্য হলো মো'মেনকে মোত্তাকী করবে। তাকওয়া অর্জনে তাকে সহায়তা করবে। জীবনের চলার পথকে সুন্দর ও মার্জিত করবে। আর তার চূড়ান্ত ফলাফল হবে এই যে, মো'মেনের লক্ষ্য অর্জন সহজ হয়ে যাবে। সেই লক্ষ্য কি আমরা জানি?

নবী করিম (সা.) এর জীবনের লক্ষ্য ছিল- আল্লাহর দেয়া জীবনবিধান মোতাবেক মানবজাতিকে পরিচালিত করে ন্যায়, সুবিচার ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করা। এ জন্য এ দীনের নাম হলো ইসলাম, শান্তি। আল্লাহ বলেছেন, তিনি সঠিক পথনির্দেশ (হেদায়াহ) ও সত্যদীনসহ স্বীয় রসুল প্রেরণ করেছেন যেন রসুল (সা.) একে সকল দীনের উপর বিজয়ী হিসাবে প্রতিষ্ঠা করেন (সুরা তওবা ৩৩, সুরা ফাতাহ ২৮, সুরা সফ ৯)। সেই সত্যদীনকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য সর্ব উপায়ে প্রচেষ্টা চালানো তাই প্রত্যেক মো'মেনের জন্যও অবশ্য কর্তব্য, ফরদ। এটাই একজন মো'মেনের জীবনের লক্ষ্য হওয়া উচিত।

কিন্তু এই দীন প্রতিষ্ঠা করতে হলে মো'মেনের অবশ্যই কিছু চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, গুণ লাগবে। সেই চারিত্রিক, মানসিক, আত্মিক গুণ, বৈশিষ্ট্য (Attributes) এটা যে সে অর্জন করবে কোত্থেকে অর্জন করবে? সেটার জন্য আল্লাহ তার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রেখেছেন। সেটা হলো সালাহ, সওম, হজ্ব, যাকাত এগুলো। এগুলোর মাধ্যমে তার চরিত্রে কিছু গুণ অর্জিত হবে। তারপর সে আল্লাহর সত্যদীন পৃথিবীময় প্রতিষ্ঠা করে মানবসমাজ থেকে অন্যায় অশান্তি দূর করতে পারবে, যেটা উম্মতে মোহাম্মদীর সৃষ্টির উদ্দেশ্য।

যেমন একটি গাড়ির উদ্দেশ্য হচ্ছে তা মানুষকে বহন করে এক স্থান থেকে আরেক স্থানে নিয়ে যাবে। এই গাড়ির প্রতিটি যন্ত্রাংশের (Parts) আবার ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্য থাকে। চাকার উদ্দেশ্য, পিস্টনের উদ্দেশ্য, সিটের উদ্দেশ্য, স্টিয়ারিং-এর উদ্দেশ্য, ইঞ্জিনের উদ্দেশ্য আলাদা আলাদা হলেও তাদের সবার সম্মিলিত উদ্দেশ্য হচ্ছে গাড়িটির এক স্থান থেকে আরেক স্থানে চলন (Movement)। গাড়িটি যদি অচল হয়, তাহলে এর যন্ত্রাংশগুলো আলাদা আলাদাভাবে যতই ভালো থাকুক লাভ নেই। তেমনি ইসলামের একটি সামগ্রিক উদ্দেশ্য আছে তা হলো - সমাজে শান্তি রাখা। মানব সমাজে যদি শান্তিই না থাকে তখন ইসলামের সব আমলই অর্থহীন। গাড়ির যেমন প্রতিটি যন্ত্রাংশের আলাদা আলাদা উদ্দেশ্য থাকে তেমনি দীনুল হকের (ইসলাম) অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি বিষয়ের আলাদা আলাদা উদ্দেশ্য আছে। কিন্তু সবগুলো মিলিয়ে মূল লক্ষ্য এক ও অভিন্ন। যেমন সালাতের উদ্দেশ্য ঐক্য, শৃঙ্খলা, আনুগত্য ইত্যাদি মো'মেনের চরিত্রে সৃষ্টি, যাকাতের উদ্দেশ্য সমাজে অর্থের সুষম বণ্টন, হজ্বের উদ্দেশ্য মুসলিম উম্মাহর জাতীয় বাৎসরিক সম্মেলন। সমগ্র মুসলিম উম্মাহ বছরে একবার তাদের জাতীয় সমস্যাগুলো নিয়ে আলোচনা করবে এবং কেন্দ্রীয় নেতার সিদ্ধান্ত মোতাবেক সমাধান করবে। একইভাবে সওমও মো'মেনের চরিত্রে একটি নির্দিষ্ট শিক্ষা দিয়ে থাকে। পরবর্তী লেখায় সে বিষয়ে আলোকপাত করার চেষ্টা করব ইনশা'আল্লাহ।

লেখক: সাহিত্য সম্পাদক, দৈনিক বজ্রশক্তি

তাদের একই অঙ্গে কত রূপ!

মোহাম্মদ আসাদ আলী

ইউক্রেন থেকে আসা এক ইহুদি শিশুকে কোলে নিয়ে প্লেন থেকে নামছেন ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী (৬ মার্চ)। ছবি: রয়টার্স

"পৃথিবীতে যদি কোনো নরক থাকে, তবে তা আছে গাজায় ফিলিস্তিনী শিশুদের জীবনে।"

কথাটা বলেছিলেন জাতিসংঘের মহাসচিব আন্টোনিও গুতেরেস। এমনি এমনি বলেননি। ২০২১ সালে তিনি যখন এই কথাটা বলেছিলেন, তখন ফিলিস্তিনে চলছিল ইসরায়েলী সেনাবাহিনীর হিটলারীয় তাণ্ডব! ওই বছর মে মাসের ১৬ তারিখে শুধু একদিনেই ইসরায়েলী সেনাবাহিনীর হামলায় প্রাণ হারিয়েছিল ৫৫ জন নিষ্পাপ ফিলিস্তিনি শিশু!

ব্রিটেন, ফ্রান্স, আমেরিকা বিমান হামলা চালিয়ে গাদ্দাফী সরকার উৎখাত করার কয়েক বছর পর এখন সবার কাছেই পরিষ্কার হয়ে গেছে পশ্চিমা ইঙ্গ-মার্কিন জোটের বিমান হামলা লিবিয়ানদের মুক্তির জন্য ছিল না। লিবিয়ার অবাধ্য শাসক গাদ্দাফীকে সরিয়ে দেশটির ভূগর্ভস্থ তেলসম্পদ দখল করাই আসল উদ্দেশ্য ছিল।

ওই ফিলিস্তিনি শিশুদের আর্তনাদ শুনে হয়ত আল্লাহর আরশ কেঁপে উঠেছিল, তাতে ইসরায়েলী শাসকদের কোনো ভাবান্তর হয়নি। পাখির মতো গুলি করে ফিলিস্তিনি শিশুদের হত্যার দৃশ্য দেখে মনে হয়েছিল আল্লাহ বোধহয় এদের মধ্যে হৃদয় বলে কিছু দেননি। তাই স্নেহ-মমতা জিনিসটা কী তা এরা জানে না। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে- হায়! ইসরায়েলীদেরও হৃদয় আছে। নিষ্পাপ শিশুদের কষ্টে এরাও ব্যথা পায়! অসহায় শিশুর চোখের দিকে তাকালে এদেরও বুকের কোথায় যেন চিনচিন করে ওঠে! সেই শিশুকে কোলে টেনে নিতে ইচ্ছা হয়! বুকে জড়িয়ে কপালে চুমু খেতে ইচ্ছা হয়। শুধু শর্ত একটাই- শিশুটাকে ইহুদি হতে হবে!

তাইতো দেখি ইউক্রেনে রাশিয়ার হামলায় উদ্বাস্তু হওয়া লক্ষ লক্ষ শিশুদের মধ্য থেকে বাছাই করে ইহুদি শিশুদেরকে বিমানে উড়িয়ে আনা হলো ইসরায়েলের তথাকথিত পবিত্র (!) ভূমিতে। স্বয়ং ইসরায়েলী প্রধানমন্ত্রী প্রাণের টানে মানবতার দেবদূত হয়ে ছুটে আসলেন বিমানবন্দরে। নিজেই বিমানে উঠে কোলে তুলে নিলেন উদ্বাস্তু হওয়া ইহুদি শিশুকে। চুমু খেলেন বারবার। সেই চুমু খাওয়ার ছবি যখন পত্রিকায় প্রকাশ হলো, বিশ্ববাসী এই প্রথম দেখতে পেল ইসরায়েলী শাসকরা শিশুদের বুক বরাবর শুধু গুলি করতেই সিদ্ধহস্ত নয়, চুমুও খেতে জানে। তবে চুমুটা সবার জন্য নয়! মুসলিম শিশুদের জন্য তো কোনোভাবেই নয়। তাদের জন্য বুলেট।

২০১১ সাল। লিবিয়ায় গাদ্দাফী সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করল বিদ্রোহীরা। পশ্চিমারা ভালোবেসে সেই নৈরাজ্যের নাম দিল আরব বসন্ত। তারপর বিদ্রোহীদেরকে অর্থ ও অস্ত্র সরবরাহ আরম্ভ করল। দেশটিতে শুরু হলো রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধ। পশ্চিমাদের ভালোবাসা যেন ফুরোয় না। তারাও লিবিয়ার বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দিল গাদ্দাফীকে উৎখাত করতে। ব্রিটেন, ফ্রান্স, আমেরিকা বিমান হামলা চালিয়ে গাদ্দাফী সরকার উৎখাত করার কয়েক বছর পর এখন সবার কাছেই পরিষ্কার হয়ে গেছে পশ্চিমা ইঙ্গ-মার্কিন জোটের বিমান হামলা লিবিয়ানদের মুক্তির জন্য ছিল না। লিবিয়ার অবাধ্য শাসক গাদ্দাফীকে সরিয়ে দেশটির ভূগর্ভস্থ তেলসম্পদ দখল করাই আসল উদ্দেশ্য ছিল। গত দশ বছর যাবৎ পশ্চিমাদের ভালোবাসার মাশুল দিচ্ছে লিবিয়ার জনগণ, আজও দেখা পায়নি গণতন্ত্রের, দেখা পায়নি স্বাধীনতার! দেশটি এখনও তলিয়ে আছে ধ্বংসস্তুপের নিচে।

লিবিয়ায় যুদ্ধের আগুন জ্বালানোর পর, বৃষ্টির মতো বোমা বর্ষণ করে শহরগুলোকে লণ্ডভণ্ড করার পর, সেই ধ্বংস্তুপের নিচে পড়ে থাকা দেহগুলোকে বরিস জনসনের কাছে হাসি-তামাশার বিষয় বলে মনে হয়েছে। এবং এই মানসিকতা দেশটির সিংহভাগ জনগণেরও, সেজন্যই ইংলিশরা এমন একজন ব্যক্তিকে প্রধানমন্ত্রী বানিয়েছে।

যুদ্ধের কারণে লিবিয়ার আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি যখন খুবই খারাপ, দেশটি থেকে লাখ লাখ মানুষ ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিয়ে ইউরোপে আশ্রয় নেওয়ার চেষ্টা শুরু করল। আর ঠিক তখনই ইউরোপ নড়েচড়ে বসল! তাদের এক কথা- মধ্যপ্রাচ্য থেকে উদ্বাস্তু হওয়া এই অভিবাসীদেরকে ইউরোপে ঠাঁই দেওয়া হবে না। রীতিমত মুসলিম অভিবাসীবিরোধী রাজনৈতিক স্লোগান তুলে ইউরোপের দেশে দেশে বহু দল জনপ্রিয়তার তুঙ্গে উঠে গেল! মুসলিম অভিবাসীদের বিরুদ্ধে ইউরোপীয়দের ঘৃণাপূর্ণ মন্তব্য ও কটূক্তিগুলো দেখলে মনে প্রশ্ন জাগে- এদেরকে সভ্য বলা হয় কোন যুক্তিতে?

এরা যে কী পরিমাণ বর্ণবিদ্বেষ ও সাম্প্রদায়িকতা হৃদয়ে লালন করে তা কল্পনাতীত। উদাহরণ দিচ্ছি। ব্রিটেন ও যুক্তরাষ্ট্রের লাগানো আগুনে লিবিয়া ধ্বংস হবার পর, ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন ২০১৭ সালে বসে পরিকল্পনা করেন লিবিয়ার যুদ্ধবিধ্বস্ত শহর সির্তেকে পর্যটনকেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা যায় কিনা, যা হবে দুবাইয়ের মতো। কেন এই চিন্তা মাথায় এলো বরিসের? সেটার ব্যাখ্যা দেন ম্যাঞ্চেস্টারে কনজারভেটিভ দলের এক সম্মেলনে। ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন- শহরের সঙ্গে আছে সুন্দর সমুদ্র ও সাদা বালির তট! এই সুন্দর সমুদ্র ও সাদা বালির তটের কথা বলার পর কোথায় যেন বাধা পেলেন মি. বরিস। পরক্ষণেই তিনি বললেন, "তবে কিনা লাশগুলো সাফ করতে হবে ওদের"। কথাটা বলে এমন ভাব করে হেসেছিলেন বরিস, যেন তিনি একটা রসিকতা করেছেন। লিবিয়ায় যুদ্ধের আগুন জ্বালানোর পর, বৃষ্টির মতো বোমা বর্ষণ করে শহরগুলোকে লণ্ডভণ্ড করার পর, সেই ধ্বংস্তুপের নিচে পড়ে থাকা দেহগুলোকে বরিস জনসনের কাছে হাসি-তামাশার বিষয় বলে মনে হয়েছে। এবং এই মানসিকতা দেশটির সিংহভাগ জনগণেরও, সেজন্যই ইংলিশরা এমন একজন ব্যক্তিকে প্রধানমন্ত্রী বানিয়েছে।

কথিত আরব বসন্তের হাঙ্গামায় ২০১১ সালে সিরিয়াতেও শুরু হয়েছিল গৃহযুদ্ধ। সিরিয়া থেকেও লাখ লাখ মানুষ উদ্বাস্তু হওয়া শুরু হলো। দেখা গেল কোনো আরব দেশ তাদেরকে জায়গা দিতে চায় না, যদিও তাদের উদ্বাস্তু হবার পেছনে আরবদের অবদান কোনো অংশে কম ছিল না।

তখন ঘর হারিয়ে দেশ হারিয়ে লক্ষ লক্ষ সিরীয় জনগণ আর কী করবে? সেই একটা রাস্তাই খোলা আছে- সমুদ্র পেরিয়ে ইউরোপে ঢোকা। তারপর যদি দয়া করে থাকতে দেয় তো দিল, না দিলে আত্মহত্যা ছাড়া পথ নেই। অবশ্য অনেককেই কষ্ট করে আর আত্মহত্যা করতে হয়নি! স্ত্রী পুত্র পরিজন নিয়ে ছোট্ট ডিঙ্গী নৌকায় সাগর পাড়ি দেওয়ার সময় বহু পরিবার নৌকাডুবির শিকার হয়ে তলিয়ে গেছে ভূমধ্যসাগরের গহীনে। সেই সঙ্গে মিটে গেছে জীবনের অনিশ্চয়তার অন্ধকার! এমনই এক হতভাগা পরিবারের শিশু আইলানের মরদেহ তুরস্কের সমুদ্রসৈকতে উপুড় হয়ে পড়ে থাকার দৃশ্য বিশ্ববিবেকে হাহাকার তুলেছিল! কিন্তু হাহাকার তুলতে পারেনি ইউরোপ আমেরিকার রাজনীতিকদের মনে।

এদিকে আমেরিকা ও রাশিয়ার ভূরাজনীতির খেলায় বারবার উত্তপ্ত হয়েছে আফগানিস্তান, দেশটিতে যুদ্ধের আগুন জ্বলে উঠেছে দফায় দফায়। আফগানস্তানের দখল নেওয়ার জন্য ইঙ্গ-মার্কিন জোট ও রাশিয়ার যে আগ্রহ দেখা গেছে, তার সিকিভাগও দেখা যায়নি আফগান জনগণকে বাঁচানোর জন্য। কেউ পাশে দাঁড়ায়নি আফগানদের। এমনকি ২০২১ সালে

আমেরিকা আফগানিস্তান ছাড়ার সময় হাজারও মানুষ আশ্রয় চেয়েছে ইঙ্গ-মার্কিন জোটের দেশগুলোতে। তাদের পেছনেও অন্ধকার, সামনেও অন্ধকার! কোথায় যাবে? আমেরিকার বিমানে জায়গা হয়নি, তাই চাকায় বসে আমেরিকা যাওয়ার চেষ্টা করে বেঘোরে প্রাণ দেওয়ার ঘটনাও দেখতে হয়েছে। বিশ্ববিবেক কেঁপে উঠেছে, কিন্তু যুক্তরাজ্য-যুক্তরাষ্ট্রের ভাবভঙ্গি দেখে মনে হয়েছে তারা কতই না অসহায়! কিছুই করার সামর্থ্য নেই আফগান জনগণের জন্য!

সব হারিয়ে প্রাণটুকু হাতে নিয়ে রোহিঙ্গারা নাফ নদী পেরিয়ে এসেছে বাংলাদেশে। বিবেকের দাবিতে একপ্রকার বাধ্য হয়েই দশ লক্ষ রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে জায়গা দিয়েছে বাংলাদেশ। কই, মুসলিম চেতনাধারী কোনো আরব দেশ তো রোহিঙ্গাদের নিজ দেশে ঠাঁই দিল না। মানবাধিকারের বুলি আউড়ানো ইউরোপ আমেরিকাও জায়গা দিল না।

গণহত্যার মুখে দশ লক্ষ রোহিঙ্গা বিতাড়িত হয়েছে মিয়ানমার থেকে। তাদের একেকজনের জীবনের দুঃখ, দুর্দশা ও স্বজন হারানোর বেদনাকে উপজীব্য করে রচনা করা যাবে শত উপন্যাস। সব হারিয়ে প্রাণটুকু হাতে নিয়ে রোহিঙ্গারা নাফ নদী পেরিয়ে এসেছে বাংলাদেশে। বিবেকের দাবিতে একপ্রকার বাধ্য হয়েই দশ লক্ষ রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে জায়গা দিয়েছে বাংলাদেশ। কই, মুসলিম চেতনাধারী কোনো আরব দেশ তো রোহিঙ্গাদের নিজ দেশে ঠাঁই দিল না। মানবাধিকারের বুলি আউড়ানো ইউরোপ আমেরিকাও জায়গা দিল না।

অথচ সেই দেশগুলোই এখন ইউক্রেনের জনগণের জন্য কী কান্নাটাই না কাঁদছে! ইউক্রেনীয়দের জন্য তাদের কান্না, তাদের আবেগ-অনুভূতি, তাদের মানবতাবোধ ও বিবেকের তেজ দেখে অবাক হচ্ছি বারবার! কীভাবে সম্ভব? একই অঙ্গে কত রূপ দেখব আমরা?

পশ্চিমা জোট দরজা খুলে দিয়েছে ইউক্রেনের জনগণের জন্য। ইউক্রেনীয়রা কীভাবে দেশ ছেড়ে পালাবে, কোন বর্ডার দিয়ে পোল্যান্ডে ঢুকবে, কোন বর্ডার দিয়ে রোমানিয়ায় ঢুকবে, কোথায় বিশ্রাম নিবে, কোথায় আশ্রয় নিবে- তা নিয়ে চিন্তায় গলদঘর্ম হয়ে যাচ্ছে পশ্চিমা নেতারা। ইউক্রেনীয়দের জন্য কোন দেশ কতটা অবদান রাখতে পারে তা নিয়ে যেন রীতিমত প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। উপচে উপচে পড়ছে মানবতা! আর এক্ষেত্রে বরিস জনসনের দেশ ব্রিটেন যেন অবস্থান করছে সবার চেয়ে এক ডিগ্রি উপরে! ব্রিটেন ইউক্রেনীয়দের জন্য সীমানা উন্মুক্ত করে দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি, ইউক্রেনের শরণার্থীদের আশ্রয় দিলে প্রতিমাসে ৩৫০ পাউন্ড করে প্রদানের ঘোষণা দিয়েছে। এ লক্ষ্যে 'হোমস ফর ইউক্রেন' নামে একটি স্কিম চালু করা হয়েছে। কোনো বৃটিশ পরিবার যদি ইউক্রেনের কোনো শরণার্থীকে আশ্রয় দেয় তাহলে তারা সরকারের এই স্কিমের আওতায় প্রতিমাসে ৩৫০ পাউন্ড বা ৪৫৬ ডলার করে পাবে। এ জন্য নিজের বাড়ির একটি রুম বা যে কোনো অংশ ইউক্রেন থেকে আগতদের জন্য বরাদ্দ রাখতে হবে।

আহা! এই মানবতার দশভাগের একভাগও যদি সিরিয়ার জনগণের ভাগ্যে জুটত! যদি লিবিয়ার জনগণের ভাগ্যে জুটত! যদি ফিলিস্তিনি জনগণের ভাগ্যে জুটত! যদি আফগান ও রোহিঙ্গাদের ভাগ্যে জুটত! একটা দেশ তাদের পাশে দাঁড়ায়নি, শুধুই মুসলিম বলে, আর কিছু নয়।

ইউক্রেন যুদ্ধ বহুভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। এর ভূরাজনৈতিক ব্যাখ্যা দিয়ে বিশ্লেষকরা সেটা তুলে ধরছেন, আরও তুলে ধরবেন। তবে আমাদের মতো সাধারণ মানুষের সামনে এই ইউক্রেন যুদ্ধ আরও একটি কারণে তাৎপর্য বহন করছে। তাহলো- এই যুদ্ধ পশ্চিমাদের মুখোস খুলে দিয়েছে। তাদের ভণ্ডামী, তাদের দ্বিচারিতা, তাদের বর্ণবিদ্বেষ আরও পরিষ্কারভাবে বোঝা গেল এই যুদ্ধে! আশা করা যায়- তাদের এই দ্বিমুখী আচরণ দেখে অন্তত কোনো মুসলিমপ্রধান দেশের জনসাধারণ তাদের উপর ভরসা করে দেশকে বিপদের দিকে ঠেলে দিবেন না। একই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি আর দেখতে চাই না। এখন সময় শিক্ষা নেওয়ার।

লেখক: সহকারী সাহিত্য সম্পাদক, দৈনিক বজ্রশক্তি

দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি রুখতে জাগতে হবে আপনাকেই

আরশাদ মাহমুদ

• **দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে রাখার দু'টো সমাধান আছে।**

প্রথম সমাধান হলো- যে পণ্যের দাম বেড়ে যাচ্ছে, সেই পণ্যের যোগান বাড়ানোর চেষ্টা করা। অর্থাৎ পণ্যটা যাতে বাজারে পর্যাপ্ত থাকে তা নিশ্চিত করা। এই যোগান বাড়ানো যেতে পারে দুইভাবে- উৎপাদন বাড়ানোর মাধ্যমে অথবা আমদানির মাধ্যমে। বাজারে পণ্যটার যোগান ঠিক রাখা গেলে, দোকানে সরবরাহ ঠিক থাকলে, আর অসাধু ব্যবসায়ীরা অবৈধভাবে মজুদ করতে না পারলে পণ্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণে রাখা খুবই সহজ।

> *এদিকে জাতির ধনীক শ্রেণির দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই- নিত্য প্রয়োজনীয় কোনো ভোগ্যবস্তুর দাম বেড়ে গেলেও জনগণের এই অংশকে কোনো ভোগান্তি পোহাতে হয় না, বা চাহিদা কমানোর কথা ভাবতে হয় না। দাম বাড়ার পরও ধনীরা সেই পণ্যটা যত ইচ্ছা কিনতে থাকে ও ভোগ করতে থাকে। যেহেতু বাজারে বেশি দামে অনেকে কিনছেই, তাই সেই পণ্যটার দাম কমার সম্ভাবনাও আর থাকে না। ব্যবসায়ীদের ব্যবসা ঠিক থাকে, উচ্চবিত্তদের জীবন-জীবিকাও ঠিক থাকে, উৎপাদকরাও সীমিত উৎপাদন দিয়েই প্রচুর মুনাফা অর্জন করতে থাকে, শুধু মানবিক বিপর্যয়ে পড়ে যায় হতদরিদ্র জনগোষ্ঠী!*

কিন্তু যদি পণ্যটা আমদানি বা উৎপাদন করা সম্ভব না হয়? ধরুন বাংলাদেশে যে পণ্যের দাম বেড়ে গেছে, সেই পণ্যটা পাওয়া যায় ইউক্রেনে। এতদিন ইউক্রেন থেকে ব্যবসায়ীরা পণ্যটা আমদানি করত। এখন যুদ্ধের কারণে পণ্য আমদানি করা যাচ্ছে না। কিংবা ধরুন, পণ্যটা এতদিন আমদানি করা হতো রাশিয়া থেকে। রাশিয়ার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ হওয়ায় এখন আর দেশটি থেকে পণ্য আমদানি করা যাচ্ছে না। আবার বাংলাদেশে সেই পণ্যটা ব্যাপকভাবে উৎপাদন করাও যাচ্ছে না, কারণ বাংলাদেশের আবহাওয়া জলবায়ু এই পণ্য উৎপাদনের সহায়ক নয়, দক্ষ জনশক্তিও নাই। তখন কী করণীয়?

তখন রয়েছে দ্বিতীয় উপায়। সেটা হলো- পণ্যটার চাহিদাও কমিয়ে ফেলা। মনে রাখতে হবে জনগণ যে জিনিস কিনবে না, সেটার দাম এমনিতেই কমে যাবে। ধরা যাক সয়াবিন তেলের দাম বেড়ে যাবার পর জনগণ সয়াবিন তেল খাওয়া বাদ দিয়ে সরিষা তেল খাওয়া শুরু করল, কিংবা সয়াবিন তেল যারা খাচ্ছে খুবই অল্প পরিমাণে খাচ্ছে। এতে কিছুদিনের মধ্যেই সয়াবিন তেলের যোগান বেড়ে যাবে এবং তার ফলে দাম কমতে শুরু করবে। তবে সাধারণত এভাবে চাহিদা কমানোর মাধ্যমে দাম কমানোর নজির খুবই কম। কেননা জনগণ কখনই ঐক্যবদ্ধভাবে কোনো পণ্যের ব্যবহার বন্ধ করতে পারে না। জনগণ ঐক্যবদ্ধ নয়।

আরেকটা কথা জেনে রাখা আবশ্যক- যে পণ্যের দাম বেড়ে যাচ্ছে সেটার চাহিদা এমনিতেও কিছুটা কমে যায়, তবে সেটা আশানুরূপ নয়। অর্থাৎ যতটা চাহিদা কমলে দাম কমে যাবে ততটা চাহিদা কমে না। বিশেষ করে পণ্যটা যদি নিত্য প্রয়োজনীয় কোনোকিছু হয়, তাহলে চাহিদা কমে না বরং চাহিদা আরও বেড়ে যায়। তখন সবার মধ্যেই পণ্যটা মজুদ করে রাখার প্রবণতা তৈরি হয়। কিছুদিন পূর্বে লবনের দাম নিয়ে গুজব রটার পর দেখা গিয়েছিল অবিশ্বাস্য রেটে সাধারণ মানুষ লবন কিনে বাড়িতে জমা করে রাখছে। অর্থাৎ দাম বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের চাহিদাও যেন বেড়ে গিয়েছিল!

এদিকে জাতির ধনীক শ্রেণির দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই- নিত্য প্রয়োজনীয় কোনো ভোগ্যবস্তুর দাম বেড়ে গেলেও জনগণের এই অংশকে কোনো ভোগান্তি পোহাতে হয় না, বা চাহিদা কমানোর কথা ভাবতে হয় না। দাম বাড়ার পরও ধনীরা সেই পণ্যটা যত ইচ্ছা কিনতে থাকে ও ভোগ করতে থাকে। যেহেতু বাজারে বেশি দামে অনেকে কিনছেই, তাই সেই পণ্যটার দাম কমার সম্ভাবনাও আর থাকে না। ব্যবসায়ীদের ব্যবসা ঠিক থাকে, উচ্চবিত্তদের জীবন-জীবিকাও ঠিক থাকে, উৎপাদকরাও সীমিত উৎপাদন দিয়েই প্রচুর মুনাফা অর্জন করতে থাকে, শুধু মানবিক বিপর্যয়ে পড়ে যায় হতদরিদ্র জনগোষ্ঠী!

এই কারণেই মূলত ভোগবাদী সমাজে চাহিদা কমানোর মাধ্যমে পণ্যের দাম কমানোর কথা চিন্তাও করা যায় না। একটা ভোগবাদী সমাজে মানুষ বেঁচেই থাকে ভোগ করার জন্য। যার বেশি সামর্থ্য সে বেশি ভোগ করে, অল্প সামর্থ্য থাকলে অল্প ভোগ করে।

কিন্তু সামর্থ্য থাকার পরও বৃহত্তর স্বার্থে ভোগ না করার মানসিকতা এই সমাজে কখনই গড়ে ওঠে না। দেশের আর্থসামাজিক হালচাল যা-ই হোক, সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও আগের চেয়ে একটু কম খাওয়া, একটু কম মানের পোশাক পরা, একটু কম খরচের চেষ্টা করার কথা ভাবতেও পারে না ভোগবাদী সমাজের মানুষ। তাই এই দিকটা নিয়ে বর্তমানের পুঁজিবাদী অর্থনীতির ধারক-বাহকরা তেমন একটা আশাবাদী হতে পারেন না। যারা সরকারের নীতিনির্ধারণ করেন, তারাও ভালোভাবেই জানেন একটা পণ্যের দাম ১০গুণ বেড়ে গেলেও জনগণের একাংশ সেই পণ্য কিনবেই। প্রধানমন্ত্রীও যদি পণ্যটি না খাওয়ার জন্য বা কম খাওয়ার জন্য জাতিকে আহ্বান করেন, জাতি সেই আহ্বান মানবে না। তাই নীতি-নির্ধারকরা পণ্যদ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধির সমাধান হিসেবে সবসময় যোগান বাড়ানো, আমদানি বাড়ানো, শুল্ক কমানো, ভ্যাট কমানো ইত্যাদি গতানুগতিক চিন্তাকেই বেছে নেন। এসবে কাজের কাজ কিছুই হয় না তা সবাই জানেন।

> ***আমাদের সওম যদি সত্যিকারের সওম হতো তাহলে একটা সওমই যথেষ্ট হতো বহু অর্থনৈতিক সঙ্কটের সমাধান এনে দেওয়ার জন্য। সমস্যা হলো- আমরা সওম পালন করি, কিন্তু সওমের উদ্দেশ্য বুঝি না এবং সওমের শিক্ষা চরিত্রে ধারণ করারও চেষ্টা করি না। আমরা সওমের নামে শুধু না খেয়ে থাকি।***

অথচ আমরা যারা নিজেদেরকে মুসলমান বলে দাবি করি, আমাদের সমাজে দ্বিতীয় সূত্রটাই কিন্তু বেশি ফলপ্রসূ হবার কথা ছিল। আমাদের সমাজের ধনীক শ্রেণির কথাই বলি কিংবা গরীব শ্রেণির কথাই বলি- তাদের কিন্তু ভোগবাদী ও বস্তুবাদী হবার কথা ছিল না। বরং কথা ছিল তারা নিজেরা না খেয়ে অন্যকে খাওয়াবে। তাদের ঘরে যদিও ফ্রিজভর্তি খাবার থাকে, লকারভর্তি টাকা থাকে, তথাপি তারা নিজের নফসকে নিয়ন্ত্রণে রাখবে, সংযমে রাখবে। এই সংযম যদি কোনো জনগোষ্ঠীর মধ্যে থাকে তাহলে সেখানে বহু অর্থনৈতিক সঙ্কটের সমাধান করা সম্ভব, আবার এই সংযম না থাকলে শত আন্তরিক প্রচেষ্টাতেও অর্থনৈতিক সঙ্কটের সমাধান সম্ভব নয়।

রমজান মাসে মুসলিমদের ফরজ আমল হলো সওম। সওম মানেই আত্মসংযম। আল্লাহ বারোটা মাসের মধ্যে একটামাস নির্ধারণ করেছেন যেই মাসে মুসলিম জনসাধারণ নিজেদের জীবনে সংযমের শিক্ষা অর্জন করবে। নিজেদের নফসকে নিয়ন্ত্রণের অনুশীলন করবে। তারপর যেই সংযম সে অর্জন করতে পারল, সেটার প্রতিফলন ঘটাবে বাকি এগারো মাসের জীবন-যাপনে। রমজান মাসে একজন মুসলিমের পেটে ক্ষুধা থাকে, টেবিলে খাবার থাকে, কিন্তু সে থাকে না খেয়ে। এই না খাওয়াটা নিজের জন্য নয়, আল্লাহর জন্য। ঠিক তেমনি রমজান মাস ছাড়াও একজন মুসলিম বহুকিছু খাবে না, বহু খরচ করবে না শুধুই আল্লাহর জন্য, মানবতার কল্যাণের জন্য, সমাজের বৃহত্তর স্বার্থের জন্য। সওম যেমন ধনী-দরিদ্র সবার জন্য ফরজ, তেমনি সমাজের স্বার্থের জন্য নিজের চাহিদাকে কমিয়ে আনার দায়িত্বও ধনী-দরিদ্র সবাইকেই পালন করতে হবে।

আমাদের সওম যদি সত্যিকারের সওম হতো তাহলে একটা সওমই যথেষ্ট হতো বহু অর্থনৈতিক সঙ্কটের সমাধান এনে দেওয়ার জন্য। সমস্যা হলো- আমরা সওম পালন করি, কিন্তু সওমের উদ্দেশ্য বুঝি না এবং সওমের শিক্ষা চরিত্রে ধারণ করারও চেষ্টা করি না। আমরা সওমের নামে শুধু না খেয়ে থাকি। আর মনে করি- সওমে না খেয়ে কষ্ট পাওয়ার মধ্যেই আছে সওয়াব। সন্ধ্যা পর্যন্ত সওয়াব অর্জনের পর মাগরিবের আজানের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সংযমের লাগাম ছিঁড়ে বেরিয়ে আসে ভোগবাদী আসল চেহারাটা! একবেলা না খেয়ে থাকার পর আরেকবেলায় দুইগুণ বেশি খাবার খেয়ে কষ্টের মাশুল আদায় করি! ফল হয় এই যে, রমজান মাস এলে দ্রব্যমূল্য কমার বদলে বেড়ে যায় কয়েকগুণ। পরিহাস আর কাকে বলে!

পরিশেষে আরেকটা কথা বলে রাখা প্রয়োজন- সবসময় খাদ্যসঙ্কটের সমাধান শুধু সংযমের মাধ্যমেই হয়ে যাবে তেমনটা মনে করার কারণ নেই। পর্যাপ্ত খাদ্যশস্য উৎপাদন করতে না পারলে দেশে খাদ্যসঙ্কট দেখা দিবেই- এটা সাধারণ জ্ঞানেই বোঝা যায়। কাজেই, খাদ্যসঙ্কট মোকাবেলায় একদিকে চাহিদার মুখে লাগাম টানার দরকার আছে, আরেকদিকে প্রচুর পরিমাণ খাদ্যশস্য উৎপাদনের দরকার আছে। বাংলাদেশে ইতোমধ্যেই খাদ্যসঙ্কট মোকাবেলায় উৎপাদনের উপর জোর দিয়ে জেলায় জেলায় কৃষি প্রকল্প গড়ে তুলেছে হেযবুত তওহীদ। তবে সেটুকু যথেষ্ট নয়। পুরো দেশের খাদ্যসঙ্কট মোকাবেলায় ১৬ কোটি মানুষকেই খাদ্যশস্য উৎপাদনের জন্য সচেষ্ট হতে হবে এবং কৃষিভিত্তিক উৎপাদনের দিকে সরকারকে আন্তরিক উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

লেখক: সদস্য, হেযবুত তওহীদ

প্রকৃত উম্মতে মোহাম্মদী আজ কোথায়?

রাকীব আল হাসান

আল্লাহ আদম (আ.) থেকে শুরু করে তার প্রত্যেক নবী-রসুলকে পাঠিয়েছেন একটিমাত্র উদ্দেশ্য দিয়ে তা হলো যার যার জাতির মধ্যে আল্লাহর তওহীদ ও তার দেওয়া জীবনব্যবস্থা, দীন প্রতিষ্ঠা করা। শেষ নবীকে (সা.) পাঠালেন সমস্ত মানবজাতির উপর এই দীন প্রতিষ্ঠা করার জন্য (কোর'আন-সূরা আল-ফাতাহ-২৮, সূরা আত-তওবা-৩৩, সূরা আস-সফ্-৯)। আমাদের শেষ নবীর (সা.) দায়িত্ব এত বিরাট যে এক জীবনে তা পূর্ণ করে যাওয়া অসম্ভব। তাই তিনি এমন একটি জাতি সৃষ্টি করলেন পৃথিবী থেকে তাঁর চলে যাওয়ার পরও যে জাতি তাঁর উপর আল্লাহর দেয়া দায়িত্ব পূর্ণ করার জন্য তারই মতো সংগ্রাম চালিয়ে যাবে। এই জাতি হলো তাঁর উম্মাহ-উম্মতে মোহাম্মদী- মোহাম্মদ (সা.) এর জাতি। বিশ্বনবী (সা.) তাঁর উম্মাহকে পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে তার চলে যাবার পর তিনি যেমন করে সংগ্রাম করে সমস্ত আরবে দীন প্রতিষ্ঠা করে সর্বরকম অন্যায়, অবিচার, অশান্তি দূর করলেন, ঠিক তেমনি করে বাকি দুনিয়ায় ঐ দীন প্রতিষ্ঠা করার দায়িত্ব তাদের উপর অর্পিত হবে। ঐটাকে তিনি বললেন 'আমার সুন্নাহ'; অর্থাৎ আমি সারা জীবন যা করে গেলাম এবং এও বললেন, যে আমার এই সুন্নাহ ত্যাগ করবে সে বা তারা আমার কেউ নয়; অর্থাৎ আমার উম্মত নয়। অবশ্যই, কারণ আল্লাহ যে দায়িত্ব দিয়ে তাঁকে পৃথিবীতে পাঠালেন, যে দায়িত্ব তিনি এক জীবনে পূর্ণ করতে না পারায় এক উম্মাহ সৃষ্টি করে তার উপর অর্পণ করে চলে গেলেন, সেই দায়িত্ব যে বা যারা ছেড়ে দেবে-ত্যাগ করবে, তারা নিশ্চয়ই তার কেউ নয়। প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের মধ্যে প্রথম যিনি বিশ্বনবীকে (সা.) রসুল বলে, প্রেরিত বলে স্বীকার করে এই দীনে প্রবেশ করলেন অর্থাৎ আবু বকর (রা.) মুসলিম হয়েই রসুলাল্লাহকে (সা.) জিজ্ঞাসা করলেন- "হে আল্লাহর রসুল! এখন আমার কাজ কী? কর্তব্য কী?" আল্লাহর শেষ নবী (সা.) যে উত্তর দিয়েছিলেন তা আমরা ইতিহাসে ও হাদিসে পাই। তিনি বললেন, "এখন থেকে আমার যে কাজ তোমারও সেই কাজ।" কোনো সন্দেহ নেই যে যদি প্রত্যেকটি মানুষ-যারা ঈমান এনে মহানবীর (সা.) হাতে মুসলিম হয়েছিলেন তারা আবু বকরের (রা.) মতো ঐ প্রশ্ন

করতেন তবে তিনি প্রত্যেককেই ঐ জবাব দিতেন। "আমার যে কাজ" বলতে তিনি কী বুঝিয়েছিলেন? তাঁর কী কাজ ছিল? তাঁর কাজ তো মাত্র একটা, যে কাজ আল্লাহ তাঁর উপর অর্পণ করেছেন। সেটা হলো সমস্ত রকমের জীবনব্যবস্থা 'দীন' পৃথিবীর বুক থেকে অকার্যকর করে দিয়ে এই শেষ দীনকে মানব জীবনে প্রতিষ্ঠা করা। ইতিহাসে পাচ্ছি, শেষ-ইসলামকে গ্রহণ করার দিনটি থেকে শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত আবু বকরের (রা.) কাজ একটাই হয়ে গিয়েছিল। সেটা ছিল মহানবীর (সা.) সংগ্রামে তাঁর সাথে থেকে তাঁকে সাহায্য করা। শুধু আবু বকর নয়, যে বা যারা নবীকে (সা.) বিশ্বাস করে মুসলিম হয়েছেন সেই মুহূর্ত থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তিনি বা তারা বিশ্বনবীকে (সা.) তাঁর ঐ সংগ্রামে সাহায্য করে গেছেন, তাঁর সুন্নাহ পালন করে গেছেন। আর কেমন সে সাহায্য! স্ত্রী-পুত্র-পরিবার ত্যাগ করে , বাড়ি-ঘর, সম্পত্তি, ব্যবসা-বাণিজ্য ত্যাগ করে, অর্ধাহারে-অনাহারে থেকে, নির্মম অত্যাচার সহ্য করে, অভিযানে বের হয়ে গাছের পাতা খেয়ে জীবন ধারণ করে এবং শেষ পর্যন্ত যুদ্ধক্ষেত্রে জীবন বিসর্জন দিয়ে। এই হলো তার উম্মাহ, উম্মতে মোহাম্মদী, তাঁর প্রকৃত সুন্নাহ পালনকারী জাতি।

উম্মতে মোহাম্মদীর যে অর্থ বললাম, আবু বকর (রা.) সহ সমস্ত সাহাবারা যে সেই অর্থই বুঝেছিলেন; বিশ্বনবী (সা.) যে সেই অর্থই তাদের বুঝিয়েছিলেন

তার অকাট্য প্রমাণ হচ্ছে রসুলাল্লাহর (সা.) পৃথিবী থেকে চলে যাওয়ার পর ৬০/৭০ বৎসর পর্যন্ত তাঁর উম্মাহর কার্যাবলী। এ ইতিহাস অস্বীকার করার কারো উপায় নেই যে নবী করিমের (সা.) পর তাঁর ঐ উম্মাহ

> ***এমন কী কারণ থাকতে পারে যেজন্য একটি দেশের প্রতিটি যুদ্ধক্ষম ব্যক্তি তার পার্থিব সব কিছু কোরবান করে বছরের পর বছর একটানা যুদ্ধ করে যেতে পারে? কারণ একটাই- মানবজাতির জীবন থেকে সর্বরকম অন্যায়, অবিচার, অশান্তি দূর করে ন্যায়, সুবিচার ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করা- এটাই হলো রসুলাল্লাহর প্রকৃত সুন্নাহ। রসুলাল্লাহ (সা.) বলেছেন, "যে বা যারা আমার সুন্নাহ ত্যাগ করবে তারা আমার কেউ নয়।"***

বৃহত্তর ক্ষেত্রে অর্থাৎ আরবের বাইরে তাঁর ঐ সংগ্রাম ছড়িয়ে দিলো এবং পৃথিবীর একটা বিরাট অংশে এই দীন প্রতিষ্ঠা করল এবং মানবজীবনে শান্তি আনলো।

আমি উম্মতে মোহাম্মদীর যে অর্থ-সংজ্ঞা করছি তা যদি ভুল হয়ে থাকে তবে ঐ উম্মাহর ঐ কাজের আর মাত্র দু'টি অর্থ হতে পারে। সে দু'টি হচ্ছে- ক) অস্ত্রের জোরে পৃথিবীর মানুষকে ধর্মান্তরিত করা। এটা হয়ে থাকলে আল্লার বাণী- "বলপূর্বক ধর্মান্তরিত করা নিষিদ্ধ" (কোর'আন- সূরা আল-বাকারা-২৫৬)- এর অর্থ আল্লাহর নবীও (সা.) বোঝেন নি, তাঁর সাহাবীরাও বোঝেন নি বা অস্বীকার করেছেন (নাউযুবিল্লাহ)। আর তা হলে অন্ততঃ ঐ সময়ের জন্য আটলান্টিকের তীর থেকে চীনের সীমান্ত আর উরাল পর্বত থেকে ভারত মহাসাগর এই ভূখণ্ডে একটাও অমুসলিম থাকতো না। কিন্তু ইতিহাস তা নয়। খ) পর-রাজ্য, পর-সম্পদ লোভে আলেকজাণ্ডার, তৈমুর, হালাকু ইত্যাদির মতো সাম্রাজ্য বিস্তার করেছেন? না, কখনো নয়। তাহলে কী? তৃতীয় এমন কী কারণ থাকতে পারে যেজন্য একটি দেশের প্রতিটি যুদ্ধক্ষম ব্যক্তি তার পার্থিব সব কিছু কোরবান করে বছরের পর বছর একটানা যুদ্ধ করে যেতে পারে? কারণ একটাই- মানবজাতির জীবন থেকে সর্বরকম অন্যায়, অবিচার, অশান্তি দূর করে ন্যায়, সুবিচার ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করা- এটাই হলো রসুলাল্লাহর প্রকৃত সুন্নাহ। রসুলাল্লাহ (সা.) বলেছেন, "যে বা যারা আমার সুন্নাহ ত্যাগ করবে তারা আমার কেউ নয়।" যে বা যারা রসুলাল্লাহর কেউ নয় সে বা তারা কি তাঁর উম্মাহ, 'উম্মতে মোহাম্মদী'? সাধারণ জ্ঞানেই বোঝা যায়- অবশ্যই নয়। অর্থাৎ তাঁর (সা.) সুন্নাহ ও তাঁর উম্মাহ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। একটা ছাড়া আরেকটা নেই। আল্লাহ তাঁর নবীর (সা.) উপর যে দায়িত্ব অর্পণ করে ছিলেন; শুধু দায়িত্ব অর্পণ করে ছিলেন তাই নয়, যে কাজটা করতে তাঁকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন, যে কাজ তিনি দায়িত্ব পাবার মুহূর্ত থেকে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত করে গেলেন- অর্থাৎ সংগ্রামের মাধ্যমে এই জীবন ব্যবস্থা, এই শেষ দীন প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা- এটাই হলো তাঁর প্রকৃত সুন্নাহ। এই সুন্নাহ ত্যাগকারীদের সম্বন্ধেই তিনি বলেছিলেন 'তারা আমার নয়'। তার ব্যক্তি জীবনের ছোটখাট, কম প্রয়োজনীয় অভ্যাসের সুন্নাহ বোঝান নি। একটা গুরুত্বপূর্ণ হাদিস উল্লেখ করছি। তিনি (সা.) বলেছেন- "এমন সময় আসবে যখন আমার উম্মাহ প্রতিটি ব্যাপারে বনি ইসরাইলকে নকল করবে। এমনকি তারা যদি তাদের মায়ের সাথে প্রকাশ্যে ব্যভিচার করে তবে আমার উম্মাহ থেকেও তাই করা হবে। বনি ইসরাইলরা বাহাত্তর ফেরকায় (ভাগে) বিভক্ত হয়েছিল, আমার উম্মাহ তিয়াত্তর ফেরকায় বিভক্ত হবে। এর একটি ভাগ ছাড়া বাকি সবই আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে।" সাহাবারা প্রশ্ন করলেন-"ইয়া রসুলাল্লাহ! সেই এক ফেরকা কোনটি?" তিনি (সা.) জবাব দিলেন-"যার উপর আমি ও আমার সঙ্গীরা (আসহাব) আছি" (হাদিস- আবদুল্লাহ বিন আমর (রা:) থেকে- তিরমিযি, মেশকাত)। এই হাদিসটির কয়েকটি অংশ আছে। আমরা একটা একটা করে বুঝে নিতে চেষ্টা করব। প্রথম কথা হলো- প্রথমেই যে তিনি 'আমার উম্মাহ' বলে শুরু করলেন তাতে তিনি তাঁর প্রকৃত উম্মাহ বোঝান নি। পেছনে যেমন বলে এসেছি অন্য জাতিগুলি থেকে আলাদা করে বোঝাবার জন্য অর্থাৎ In genaral sense। দ্বিতীয়তঃ বনি ইসরাইল বলতে তিনি বর্তমানে ইহুদি-খ্রিস্টান (Judio-Christian Civilisation) সভ্যতা বুঝিয়েছেন। 'পাশ্চাত্য সভ্যতা' শব্দটি শুনলেই আমাদের মনে খ্রিষ্টান ইউরোপ ও আমেরিকার কথাই মনে আসে। কিন্তু আসলে এরা গোঁড়া ইহুদি। ঈসা (আ.) খাঁটি ইহুদি বংশে জন্মেছিলেন, নিজে ইহুদি ছিলেন, তাঁর প্রত্যেকটি শিষ্য ইহুদি ছিলেন, ইহুদিদের বাইরে তাঁর শিক্ষা প্রচার করা তাঁরই নিষেধ ছিল। অর্থাৎ মুসার (আ.) দীনকে তাঁর ধর্মের আলেম-যাজকরা বিকৃত, ভারসাম্যহীন করে ফেলায় সেটাকে আবার ভারসাম্যে ফিরিয়ে আনাই ছিল তাঁর কাজ, নতুন কোনো ধর্ম সৃষ্টি করা নয়। কিন্তু সেটাকে কেমন করে একটা নতুন ধর্মের রূপ দেওয়া হয়েছিল তা এখানে উল্লেখ করতে গেলে লেখাটি অনেক বড় হয়ে যাবে।

কাজেই বিশ্বনবী (সা.) এখানে আলাদা করে খ্রিষ্টান না বলে একেবারে গোড়ায় ধরে শুধু ইহুদি বলছেন, কিন্তু বোঝাচ্ছেন আজকের এই জুডিও-খ্রিষ্টান সভ্যতা। তিনি বলছেন আমার উম্মাহ ঐ ইহুদি-খ্রিষ্টান অর্থাৎ বর্তমানের পাশ্চাত্য সভ্যতাকে নকল-অনুকরণ করতে করতে হীনম্মন্যতার এক বীভৎস পর্যায় পর্যন্ত যাবে। আজ নিজের জাতিটির দিকে চেয়ে দেখুন- যেটাকে সবাই বিনা দ্বিধায় উম্মতে মোহাম্মদী বলে বিশ্বাস করে- এ জাতির রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক শিক্ষা, আইন-দণ্ডবিধি ইত্যাদি প্রত্যেকটি জিনিস ঐ ইহুদি-খ্রিষ্টানদের নকল-অনুকরণ। এ সমস্ত ব্যাপার থেকে আল্লাহর দীন ও তাঁর আদেশ সম্পূর্ণভাবে বাদ দেয়া হয়েছে। যে উম্মাহটাকে সৃষ্টিই করা হয়েছে ঐগুলি নিষ্ক্রীয়-অকেজো করে দিয়ে বিশ্বনবীর (সা.) মাধ্যমে দেওয়া দীনকে পৃথিবীময় প্রতিষ্ঠা করার জন্য, সেই উম্মাহই যদি নিজেরটা ত্যাগ করে ওগুলো গ্রহণ ও নিজেদের উপর প্রতিষ্ঠা করে তবে সেই উম্মাহকে 'উম্মতে মোহাম্মদী' বলার চেয়ে হাস্যকর ও অসত্য আর কী হতে পারে?

যে একটি মাত্র ফেরকা (ভাগ) জান্নাতী হবে- যেটার কথা রসুলাল্লাহ (সা.) বলেছেন- সেটা সেই কাজ নিয়ে থাকবে যে কাজের উপর তিনি ও তাঁর আসহাব ছিলেন। তিনি ও তাঁর আসহাব কীসের উপর- কোন কাজের উপর ছিলেন? সেই মহাজীবনী যারা পড়েছেন, তাঁর (সা.) সাহাবাদের ইতিহাস যারা পড়েছেন-তাদের এ কথা স্বীকার করা ছাড়া কোনো পথ নেই যে, নবুয়ত পাওয়ার সময় থেকে শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত এই অতুলনীয় মানুষটির একটিমাত্র কাজ ছিল। সেটা হলো এই শেষ জীবনব্যবস্থা পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা করে মানুষের জীবনে ন্যায়-শান্তি আনা এবং তার জীবিত অবস্থায় ও তাঁর ওফাতের পরে তাঁর সঙ্গীদেরও (আসহাব) জীবন ঐ একই কাজে ব্যয় হয়েছে। অর্থাৎ নেতা ও তার জাতির সম্পূর্ণ জীবন কেটেছে মানব জাতির কল্যানের জন্য।

দ্বিতীয় কথা হলো রসুলাল্লাহ (সা.) বলেছেন- বনি ইসরাইল বাহাত্তর ফেরকায় বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল, আমার উম্মাহ তিয়াত্তর ফেরকায় বিভক্ত হবে এবং মাত্র একটি ফেরকা (যেটা জান্নাতী) বাদে সবগুলি ফেরকাই আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে। অতি স্বাভাবিক কথা। কারণ যে ঐক্য ছাড়া পৃথিবীতে কোনো কাজই করা সম্ভব নয়, কাজেই যে ঐক্যকে অটুট রাখার জন্য আল্লাহ সরাসরি হুকুম করলেন-"আমার দেওয়া দীন সকলে একত্রে ধরে রাখো এবং নিজেরা বিচ্ছিন্ন হয়োনা।" (কোর'আন-সূরা আল ইমরান-১০৩)- যে ঐক্যকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য মহানবী (সা.) বললেন, "কোর'আনের কোনো আয়াতের অর্থ নিয়ে তর্ক-বিতর্ক কুফর।" (হাদিস-আব্দাল্লাহ বিন আমর (রা:) থেকে- মুসলিম, মেশকাত), যে ঐক্য ও শৃঙ্খলা সুদৃঢ় করার জন্য বললেন-"কান কাটা নিগ্রো ক্রীতদাসও যদি তোমাদের নেতা হয় তাহলেও ঐক্যবদ্ধভাবে তার আদেশ নির্দেশ পালন কর।" (হাদীস- ইরবাদ বিন সারিয়াহ (রা:) থেকে আহমদ, আবু দাউদ তিরমিযি এবং ইবনে মাজাহ, মেশকাত) (এই ঐক্য অটুট রাখার জন্য আল্লাহ ও তাঁর রসুল (সা.) কতভাবে চেষ্টা করেছেন তা কোর'আন এবং হাদীস থেকে দেখাতে গেলে আলাদা বই হয়ে যাবে।) সেই ঐক্যকে যারা ভেঙ্গে তিয়াত্তর ফেরকায় বিভক্ত হয়ে যাবে- তারা আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে না তো কোথায় নিক্ষিপ্ত হবে? জান্নাতে?

তৃতীয় কথা হলো যে একটি মাত্র ফেরকা (ভাগ) জান্নাতী হবে- যেটার কথা রসুলাল্লাহ (সা.) বলেছেন- সেটা সেই কাজ নিয়ে থাকবে যে কাজের উপর তিনি ও তাঁর আসহাব ছিলেন। তিনি ও তাঁর আসহাব কিসের উপর- কোন কাজের উপর ছিলেন? সেই মহাজীবনী যারা পড়েছেন, তাঁর (সা.) সাহাবাদের ইতিহাস যারা পড়েছেন-তাদের এ কথা স্বীকার করা ছাড়া কোনো পথ নেই যে, নবুয়ত পাওয়ার সময় থেকে শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত এই অতুলনীয় মানুষটির একটিমাত্র কাজ ছিল। সেটা হলো এই শেষ জীবনব্যবস্থা পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা করে মানুষের জীবনে ন্যায়-শান্তি আনা এবং তার জীবিত অবস্থায় ও তাঁর ওফাতের পরে তাঁর সঙ্গীদেরও (আসহাব) জীবন ঐ একই কাজে ব্যয় হয়েছে। অর্থাৎ নেতা ও তার জাতির সম্পূর্ণ জীবন কেটেছে মানব জাতির কল্যানের জন্য। যে কল্যাণের একটিমাত্র পথ-মানুষের জাতীয় ও ব্যক্তিগত জীবনে আল্লাহর দেওয়া জীবন বিধান প্রতিষ্ঠা, সমস্ত মানব জাতিকে অন্যায়-অবিচার-অশান্তি-যুদ্ধ ও রক্তপাত থেকে উদ্ধার করে পরিপূর্ণ শান্তি, ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা। যে বা যারা এই সংগ্রাম করবে শুধু তারাই রসুলাল্লাহর (সা.) সুন্নাহ পালনকারী, অর্থাৎ যার উপর আল্লাহর রসুল (সা.) ও তার আসহাব (রা.) ছিলেন। ইতিহাসের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে বিশ্বনবীর (সা.) ঐ সঙ্গীরা (আসহাব) তাঁর ওফাতের পর তাদের নেতার উপর আল্লাহর অর্পিত কাজ একাগ্রচিত্তে চালিয়ে গেলেন, পার্থিব সমস্ত কিছু উৎসর্গ করে চালিয়ে গেলেন। কারণ তাদের কাছে

ঐ কাজ ছিল বিশ্বনবীর (সা.) সুন্নাহ। ইতিহাসের দিকে লক্ষ্য করলে আরও দেখা যায় যে, বিশ্বনবীর (সা.) সংসর্গ যারা লাভ করেছিলেন; সরাসরি তাঁর কাছ থেকে এই দীন শিক্ষা করেছিলেন; এই দীনের উদ্দেশ্য এবং সেই উদ্দেশ্য অর্জনের প্রক্রিয়া শিক্ষা করেছিলেন তারা তাঁর (সা.) ওফাতের পর ৬০/৭০ বছর পর্যন্ত বেঁচেছিলেন এবং ঐ ৬০/৭০ বছর পর বিশ্বনবীর (সা.) সাক্ষাত-সঙ্গীরা (রা.) শেষ হয়ে যাবার পরই পৃথিবীতে এই দীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এই সংগ্রাম যেই মুহূর্তে বন্ধ হলো জাতি হিসাবে ত্যাগ করা হলো সেই মুহূর্ত থেকে জাতি হিসাবে প্রকৃত উম্মতে মোহাম্মদী শেষ হয়ে গেলো। সেই জন্য মহানবী (সা.) তাঁর সুন্নাহ বলতে শুধু তাঁর নিজের সুন্নাহ বললেন না। বললেন- "আমি ও আমার সঙ্গীরা যার উপর আছি" এবং অন্য সময় এও বললেন যে "আমার উম্মাহর আয়ু ৬০/৭০ বছর।"

আজ আমরা কিছু আরবীয় লেবাস ধারণ করে, আলিশান মসজিদ নির্মাণ করে, ডান কাতে শুয়ে, খাওয়ার আগে নিমক আর খাওয়ার পরে মিষ্টি খেয়ে, টাখনুর উপর পাজামা পরে, গোল হয়ে বসে পাড়া কাপিয়ে যেকের করে ভাবছি পাক্কা উম্মতে মোহাম্মদী হয়ে গেছি। আর অন্যদিকে এই জাতি সর্বত্র লাঞ্ছিত, নিগৃহীত, উদ্বাস্তু, ইউরোপের রাস্তায় রাস্তায় অসহায় জীবন যাপন করছে, নিজেদের মধ্যে অনৈক্য-হানাহানি-মারামারিতে লিপ্ত, আমাদের সমাজসহ সারা বিশ্বের মানুষ শান্তিতে আছে নাকি অশান্তিতে আছে এ নিয়ে যাদের মাথা ব্যথা নেই, স্বার্থপরের মতো জীবন অতিবাহিত করছে তারা আসলে নিজেদেরকে উম্মতে মোহাম্মদী ভেবে আহাম্মকের স্বর্গে বাস করছেন। এরা না মুসলিম আর না তো এরা উম্মতে মোহাম্মদী।

লেখক: শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ বিষয়ক সম্পাদক,
হেযবুত তওহীদ

সেই রুদ্র আসিতেছেন!

রিয়াদুল হাসান

'নগর বাউল' হিসাবে পরিচিত রকসঙ্গীত শিল্পী জেমস একটি গানে বিশ্বশান্তির পতাকাবাহী একজন নেতার আগমন বার্তা ঘোষণা করেছিলেন। গানটির শিরোনাম 'লিডার আসছে'।

"ভলগা থেকে রাইন, ইরাক থেকে প্যালেস্টাইন,
শান্তির পতাকা উড়বে আবার ঘরে ঘরে,
হুইসেল বাজিয়ে জানান দিয়ে, ভালোবাসার চালান নিয়ে
লিডার আসছে, লিডার আসছে॥
বুনো পথ বুনো হাওয়া লাল নিশান উড়িয়ে
মেঠো পথে মাঠে ঘটে ধুলো ধুলো উড়িয়ে
লিডার আসছে, লিডার আসছে॥"

সমগ্র বিশ্ব যখন মানুষের রক্তে পিচ্ছিল, শান্তির ললিত বাণী যখন ব্যর্থ পরিহাস, যখন বিশ্বনেতারা একে অন্যের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে ক্রুদ্ধ শ্বাপদের মতো হুঙ্কার দিচ্ছেন, খসে পড়ছে তাদের সভ্যতার মুখোস- তখন বুঝতে বাকি থাকে না যে, পৃথিবীর প্রেক্ষাপট প্রস্তুত হয়ে আছে দুটো সম্ভাব্য পরিণতির জন্য- হয় মানবজাতি ধ্বংস হয়ে যাবে অথবা কোনো একজন মহান নেতার আবির্ভাব ঘটবে যিনি যে কোনোভাবেই হোক পতনোন্মুখ এই মানবজাতিকে ধ্বংসের কিনার থেকে রক্ষা করবেন।

আশায় মানুষ বাঁচে। আশাই মানুষকে সংকট মোকাবেলার জন্য লড়াইয়ের অনুপ্রেরণা যোগায়। এই গানটিতে এমনই একজন দুর্ধর্ষ নেতার আবির্ভাবের আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন নগর বাউল। কে সেই নেতা যিনি বুনো পথে, মেঠো পথে ধুলো উড়িয়ে ভালোবাসার চালান নিয়ে ছুটে আসছেন, কে তিনি যিনি পৃথিবীর ঘরে ঘরে শান্তির পতাকা উড্ডীন করবেন? সেটা গীতিকারই ভালো বলতে পারবেন, তবে অনেকেই ধরে নিয়েছেন যে এখানে ঈসা (আ.) বা ইমাম মাহদী (আ.) এর আগমনবার্তা দেওয়া হয়েছে।

সে যা-ই হোক, মানব ইতিহাসের এই ক্রান্তিলগ্নে একজন ত্রাণকর্তার জন্য প্রতিটি মানুষের হৃদয় প্রতীক্ষা করে আছে এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। মানব ইতিহাসে এমনটাই বার বার হয়েছে, সময়ের প্রয়োজনেই সৃষ্টি হয়েছে মহান বিপ্লবী মহানায়কদের। পূর্বে মানুষকে সংকট থেকে উদ্ধার করতে আল্লাহ যথাসময়ে নবী-রসুলগণকে প্রেরণ করতেন। যেমন তিনি ফেরাউনের নিষ্পেষণের কবল থেকে বনী ইসরাইল জাতিকে উদ্ধার করতে মুসা (আ.)-কে প্রেরণ করলেন। যে মুহূর্তে কোনো সংকটের জন্ম হয়, সেই মুহূর্তে তার সমাধানেরও জন্ম হয়। আল্লাহ নিজে প্রচ্ছন্ন থেকে সেই সমাধান কোনো না কোনো মাধ্যম ব্যবহার করে মানুষের কাছে পৌঁছান। এটা আল্লাহর বেঁধে দেওয়া চিরন্তন নিয়ম। যখন মানুষ নিজেদের কর্মদোষে সহস্রমুখী সংকজালে বন্দী হয়ে

আর তা থেকে মুক্তির কোনো পথ বের করতে পারে না, তাদের হৃদয়ের হাহাকার আল্লাহর আরশ স্পর্শ করে, তখন আল্লাহ স্বয়ং হস্তক্ষেপ করেন। মানুষের

> ***একটি যন্ত্র যিনি বানিয়েছেন তার চেয়ে ভালো করে কেউ আর ঐ যন্ত্রের কলকব্জা ও পরিচালনা পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে পারে না। ঠিক তেমনি আল্লাহ মানুষ সৃষ্টি করেছেন। একমাত্র তিনিই মানুষের জীবনের যাবতীয় সমস্যার সমাধান জানবেন এটাই স্বাভাবিক। সেই জ্ঞান আল্লাহ যুগে যুগে তাঁর নবী-রসুলগণের মাধ্যমে মানুষকে দান করেছেন। তাঁরা মূলত একটি আদর্শ নিয়ে এসেছেন যার মূল ভিত্তি ছিল একটিই- আল্লাহর হুকুম ছাড়া আর কারো হুকুম মানা যাবে না এই অঙ্গীকার করা।***

সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার জন্য সময় নির্দিষ্ট করা আছে। তার পূর্বে মানুষকে কোনো না কোনো উপায়ে তিনি রক্ষা করবেনই। আল্লাহ যদি তাঁর নির্বাচিত ও মনোনীত মো'মেন বান্দাদের দিয়ে রক্ষা করেন তাহলে সেখানে তারা আল্লাহর আদেশ-নিষেধ প্রতিষ্ঠা করে, ফলে মানুষ ন্যায়, নিরাপত্তা, সুবিচার তথা শান্তি লাভ করে। আল্লাহ বলেন,

তোমাদের কি হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহর পথে এবং অসহায় নরনারী ও শিশুদের (উদ্ধারের) জন্য সংগ্রাম করবে না? যারা বলছে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! অত্যাচারী অধিবাসীদের এই নগর হতে আমাদেরকে বাহির করে অন্যত্র নিয়ে যাও এবং তোমার নিকট হতে কাউকে আমাদের অভিভাবক কর এবং তোমার নিকট হতে কাউকে আমাদের সহায় নিযুক্ত কর।'

(সুরা নিসা ৭৫)

এই আয়াতে একজন উদ্ধারকর্তা, অভিভাবক বা সহায় প্রেরণ করার জন্য অসহায় নর-নারী ও শিশুদের ক্রন্দনের প্রতিকারস্বরূপ আল্লাহ মো'মেনদেরকে প্রশ্ন করলেন, "তোমরা কি আল্লাহর রাস্তায় সংগ্রাম (জেহাদ) করবে না?" আল্লাহ নিজে আরশ থেকে নেমে এসে মানুষের কোনো সমস্যার সমাধান করেন না। তিনি মানুষকে তাঁর প্রতিনিধি হিসাবে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন (সুরা বাকারা ৩০) এবং তাদের কাছে প্রদান করেছেন সংকট সমাধানের জন্য সঠিক দিকনির্দেশনা (হেদায়াহ) ও সত্য জীবনব্যবস্থা। সেই দিক নির্দেশনা মেনে সেই জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম করাই হচ্ছে বিপন্ন মানুষকে উদ্ধার করার একমাত্র পথ। তাই পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ আবারও তাগিদ দিচ্ছেন,

"যারা বিশ্বাসী (মো'মেন) তারা আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে এবং যারা সত্য প্রত্যাখ্যানকারী (কাফের) তারা তাগুতের পথে সংগ্রাম করে। সুতরাং তোমরা শয়তানের বন্ধুদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম কর। নিশ্চয় শয়তানের কৌশল দুর্বল।"

(সুরা নিসা ৭৬)

একটি যন্ত্র যিনি বানিয়েছেন তার চেয়ে ভালো করে কেউ আর ঐ যন্ত্রের কলকব্জা ও পরিচালনা পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে পারে না। ঠিক তেমনি আল্লাহ মানুষ সৃষ্টি করেছেন। একমাত্র তিনিই মানুষের জীবনের যাবতীয় সমস্যার সমাধান জানবেন এটাই স্বাভাবিক। সেই জ্ঞান আল্লাহ যুগে যুগে তাঁর নবী-রসুলগণের মাধ্যমে মানুষকে দান করেছেন। তাঁরা মূলত একটি আদর্শ নিয়ে এসেছেন যার মূল ভিত্তি ছিল একটিই- আল্লাহর হুকুম ছাড়া আর কারো হুকুম মানা যাবে না এই অঙ্গীকার করা। আল্লাহ বলেন,

"বস্তুতঃ আমি একমাত্র এই উদ্দেশ্যেই রসুল প্রেরণ করেছি, যাতে আল্লাহর নির্দেশানুযায়ী তাঁদের আদেশ-নিষেধ মান্য করা হয়।

(সুরা নিসা ৬৪)

আখেরি নবী মোহাম্মদ (সা.) ও সেই একই কাজ করলেন। একমাত্র আল্লাহর হুকুম ছাড়া আর কারো হুকুম মানবো না, এমন অঙ্গীকার তিনি তাঁর অনুসারীদের থেকে গ্রহণ করলেন। একটি ইস্পাতকঠিন ঐক্যবদ্ধ জাতি তিনি গঠন করলেন। ঐক্যের শক্তির চেয়ে বড় কোনো শক্তি নেই। ঐক্যবদ্ধ একঝাঁক মৌমাছি একটি প্রকাণ্ড হস্তীকেও ধরাশায়ী করে ফেলতে পারে। এই শক্তির সঙ্গে তিনি যুক্ত করলেন অনন্য সামরিক শৃঙ্খলা ও আনুগত্য, অন্যায়বিরোধী মানসিকতা। তাদেরকে করে তুললেন শাহদাত পিপাসু দুর্ধর্ষ যোদ্ধাজাতিতে। তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে প্রাণপণ সংগ্রাম করে আল্লাহর দেওয়া আদর্শ অর্থাৎ দীনুল হক ইসলাম প্রতিষ্ঠা করলেন। আল্লাহর আদেশ ও নিষেধগুলো সমাজে বিশেষ করে মানুষের সামষ্টিক জীবনে কার্যকর করলেন। ফলে মানুষ সকল রাজনৈতিক সংকট, অর্থনৈতিক সংকট, নিরাপত্তাহীনতার সংকট, খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থান-শিক্ষা-চিকিৎসার মানবিক সংকট, আধ্যাত্মিক সংকট থেকে মুক্তি পেয়ে গেল। প্রতিষ্ঠিত হলো অনির্বচনীয় অনাবিল শান্তি, একেবারে আক্ষরিক অর্থে 'ইসলাম'। আরবের অজ্ঞ বেদুইনরা বিশ্বের বুকে অপ্রতিদ্বন্দ্বী পরাশক্তিরূপে আবির্ভূত হলো। তাদের সঙ্গে সামরিক সংঘর্ষে ঝড়ের মুখে শুকনো খড়কুটোর মতো উড়ে গেল দু-দুটো পরাশক্তি- রোম ও পারস্য। পরবর্তীতে তারাই সভ্যতার প্রতিটি অঙ্গনে বিশ্ববাসীর শিক্ষকের

আসনে আসীন হয়ে গেলেন এবং প্রায় সাতশত বছর মুসলমানদের সোনালি যুগ মানবজাতিকে তাদের অভিমুখী করে রাখলো।

> *আজকের বিশ্বব্যবস্থা ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে। একে একে ধ্বসে পড়ছে এর প্রতিটি ব্যবস্থা বা সিস্টেম। অসাম্প্রদায়িকতা, মানবাধিকার, গণতন্ত্রের উদার বক্তব্য ফাঁকাবুলিতে পরিণত হয়েছে। বিশ্ব চলছে পারমাণবিক অস্ত্রের ইশারায়। যার হাতে বেশি ধ্বংসকারী মারণাস্ত্র তার কথাই আইন। বাকি সব কথার কথা। প্রতিটি শক্তিশালী রাষ্ট্রের নেতার কাছে কেবল নিজের দেশ ছাড়া বাকি পৃথিবীর সকল মানুষের জীবন মূল্যহীন।*

মানব ইতিহাসের এই যে বিরাট এক ঘটনা, এর মূলে ছিলেন একজনমাত্র ব্যক্তি, যিনি আমাদের নবী, আমাদের নেতা, আমাদের উত্তম আদর্শ। তাঁকে কেন্দ্র করেই ১৪শ বছর আগের পৃথিবীতে সেই ঘুর্ণিঝড়টি সৃষ্টি হয়েছিল, যে ঝড় সকল অন্যায়কে উড়িয়ে নিয়ে অর্ধেক দুনিয়ায় একটি শান্ত-সুশীতল, প্রগতিশীল জীবনধারা দিয়েছিল। সেই আদর্শ মুসলিম জাতি হারিয়ে ফেলায় তারা একটা সময়ে এসে আবার পচন ও পতনের প্রক্রিয়ায় পড়ে যায় এবং অন্যান্য জাতির পদানত হয়ে যায়। কিন্তু সেই মূল কেতাব কোর'আন আজও অক্ষত রয়েছে এবং চিরদিন থাকবে। আল্লাহ এটা রেখেছেন যেন মানুষ যাবতীয় বাস্তব সংকট থেকে আত্মরক্ষা করতে সক্ষম হয়। এখন প্রয়োজন কেবল একজন নেতার যাকে কেন্দ্র করে আবার মানবজাতি ঐক্যবদ্ধ হবে, আবার সুশৃঙ্খল হবে, দুর্বার সংগ্রাম গড়ে তুলবে যাবতীয় অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে।

আজকের বিশ্বব্যবস্থা ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে। একে একে ধ্বসে পড়ছে এর প্রতিটি ব্যবস্থা বা সিস্টেম। অসাম্প্রদায়িকতা, মানবাধিকার, গণতন্ত্রের উদার বক্তব্য ফাঁকাবুলিতে পরিণত হয়েছে। বিশ্ব চলছে পারমাণবিক অস্ত্রের ইশারায়। যার হাতে বেশি ধ্বংসকারী মারণাস্ত্র তার কথাই আইন। বাকি সব কথার কথা। প্রতিটি শক্তিশালী রাষ্ট্রের নেতার কাছে কেবল নিজের দেশ ছাড়া বাকি পৃথিবীর সকল মানুষের জীবন মূল্যহীন। ইসরাইলের কাছে কেবল ইহুদিরা মানুষ, আর সব ভেড়ার পাল (গয়িম)। আমেরিকার কাছে আমেরিকার নাগরিকরাই মানুষ। রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিন তো বলেই দিয়েছেন, "যে পৃথিবীতে রাশিয়া থাকবে না, সেই পৃথিবী থাকার দরকার কি?"

ইউক্রেনে রুশ আগ্রাসনের পরিপ্রেক্ষিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন ব্যাপক অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে রাশিয়ার ওপর, যার প্রভাব ইতোমধ্যে দৃশ্যমান হতে শুরু করেছে। বিশ্ববাজারে জ্বালানি তেল ও গ্যাসের অন্যতম জোগানদার রাশিয়া। ইউরোপে পাইপলাইনের মাধ্যমে রাশিয়ার গ্যাস সরবরাহ চালু আছে এখনো কিন্তু রুশ তেল-গ্যাসের ওপর যুক্তরাষ্ট্র নিষেধাজ্ঞা দেওয়ার ফলে বিশ্ববাজারে এ পণ্য দুটির দাম হু হু করে বাড়ছে। প্রতি ব্যারেল তেলের দাম এরই মাঝে ১০০ ডলার ছাড়িয়ে গেছে।

ইউরোপের কয়লা আমদানিরও ৪৭ শতাংশ আসে রাশিয়া থেকে। বিশ্ববাজারে ১৫ শতাংশ কয়লার জোগান দেয় রাশিয়া। যুদ্ধ শুরুর পর আন্তর্জাতিক বাজারে কয়লার দাম দ্বিগুণের বেশি হয়ে প্রতি টন এখন বিক্রি হচ্ছে ৩৫০ ডলারে। কয়লার এই মূল্যবৃদ্ধি কিয়েভ থেকে প্রায় ছয় হাজার কিলোমিটার দূরের দেশ বাংলাদেশের পঞ্চগড়ে গড়ে ওঠা চা শিল্পের উপরও আঘাত হেনেছে। প্রতি কেজি চা বানাতে শুধু কয়লা বাবদ ব্যয় ৯ বা ১০ টাকা থেকে বেড়ে হয়েছে ২১ টাকা। ফলে পঞ্চগড়ের চা উৎপাদকদের লাভের গুড় পুরোটাই খেয়ে নিচ্ছে যুদ্ধের পিঁপড়া। দূরবর্তী এ যুদ্ধ শুধু পঞ্চগড়কেই নয়, স্পর্শ করেছে সারা দেশকে। দ্রব্যমূল্য এমনিতেই বাড়ছিল, যুদ্ধ সে আগুনে ঘৃতাহুতি দিচ্ছে। প্রান্তিক মানুষ হিমশিম খাচ্ছে জীবনযাত্রার ব্যয় নির্বাহে। জ্বালানির উচ্চ মূল্য, পরিবহন, শিল্পোৎপাদন- সব ক্ষেত্রেই চাপ সৃষ্টি হয়েছে। একে একে ভেঙে পড়ছে দেশে থেকে আন্তর্জাতিক অঙ্গনের প্রতিটি ব্যবস্থা। যে দেশগুলো মারণাস্ত্র ও যুদ্ধ-সরঞ্জাম প্রস্তুত ও রপ্তানি করে কেবল তারাই ত্বরিৎ সমৃদ্ধির স্বপ্ন দেখছে।

সম্প্রতি ব্রাসেলসে ইউরোপীয় ইউনিয়নের কৃষিমন্ত্রীরা আশঙ্কা প্রকাশ করেন যে, প্রধান কৃষি পণ্য রফতানিকারক দুই দেশ ইউক্রেন ও রাশিয়ার যুদ্ধের কারণে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিতে পারে। লেবানন, মিশর, ইয়েমেনসহ বেশ কিছু দেশ গত কয়েক বছর ধরে তাদের বার্ষিক গমের চাহিদার জন্য ইউক্রেনের ওপর নির্ভরশীল; কিন্তু যুদ্ধের প্রভাবে বিশ্ববাজারে বাড়তে শুরু করেছে গমের দাম। এক প্রতিবেদনে বার্তাসংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে, গতমাসের তুলনায় ইতোমধ্যে গমের দাম ৫০ শতাংশ বেড়েছে। গম আমদানিতে বাংলাদেশও অনেকটাই রাশিয়া ও ইউক্রেনের উপর নির্ভরশীল। যুদ্ধের প্রভাবে দেশে ইতিমধ্যেই ৫০ কেজি আটার বস্তাপ্রতি দাম ২৫০ টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে।

ইউক্রেনের যুদ্ধে জয়-পরাজয় যারই হোক না কেন, সামনে যে বিশ্বের অনেক কিছুই বদলে যাবে তা নিশ্চিত। যুদ্ধ শুরুর সঙ্গে সঙ্গেই আমরা দেখছি জার্মানি তার প্রতিরক্ষা ব্যয় এক দফায় দ্বিগুণ করেছে। এই যুদ্ধ-পরবর্তী অবস্থা অনিবার্যভাবেই পৃথিবীতে নতুন করে অস্ত্র প্রতিযোগিতা শুরু করতে যাচ্ছে, যা তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধকে অনিবার্য করে তুলবে।

ইউক্রেনের জনসাধারণের কান্না দেখে এখন আর মানুষ বিচলিত হয় না, কারণ কয়েক প্রজন্ম ধরে তারা ফিলিস্তিন, ইরাক, সিরিয়া, আফগানিস্তান, লিবিয়া, মায়ানমারের বৃদ্ধ, নারী, শিশুদের রক্তাক্ত মৃতদেহ, কান্না, ধর্ষণ, উদ্বাস্তুজীবন দেখেই আসছে। হয়ত আরো বহু রক্ত দেখার বাকি আছে, বহু ক্ষুধার্তের ক্রন্দন শোনা বাকি আছে, বহু ধর্ষিতার হাহাকার তাদেরকে দেখতে হবে। কারণ এগুলো নির্বিকার মানুষের পাপের ফল, যারা এসব অন্যায় দেখে তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেনি, লড়াই করেনি। তাদের আত্মকেন্দ্রিক স্বার্থপর জীবনযাপনের সুযোগ নিয়ে দাজ্জাল নামক মহা ধ্বংসকারী দানবীয় সভ্যতা তার শক্তি অর্জন করেছে। তাদের পায়ের নিচে পিষ্ট হবে মানবজাতি। এটা তাদের পরিণতি। আল্লাহ বলেন,

"স্থলে ও জলে যে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে তা মানুষের কৃতকর্মের দরুন। আল্লাহ চান তাদেরকে তাদের কর্মের শাস্তি আস্বাদন করাতে, যাতে করে তারা ফিরে আসে।" (সুরা রুম,আয়াত ৪১)। তোমাদের উপর যে বিপদই উপনীত হয় তা তোমাদেরই দুই হাতের উপার্জন। (সুরা শুরা ৩০)

আল্লাহ চান এই কৃতকর্ম ভোগের দরুন যেন মানুষ তাদের ভুল বুঝতে পারে এবং আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করে। আল্লাহ চান নিগৃহীত, বঞ্চিত, অত্যাচারিত, অবহেলিত মানুষকে মানুষের মর্যাদা প্রদান করতে। তিনি বলেন,

অত্যাচার ও নির্যাতনের মাধ্যমে যাদেরকে পৃথিবীতে দুর্বল করে রাখা হয়েছে, আমি তাদের প্রতি বিশেষ অনুকম্পার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। তাহলো আমি তাদের এমাম (কর্তৃত্বের অধিকারী, নেতা) বানাবো, তাদের উত্তরাধিকারী করব, তাদেরকে পৃথিবীর উপর ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করব। এবং ফেরাউন, হামান ও তাদের সেনাবাহিনীদেরকে সেই পরিণাম স্বচক্ষে দেখাব, যার তারা আশঙ্কা করে থাকে। (সুরা কাসাস ৫, ৬)।

মানবতার এই চরম বিপর্যয়ের দিনে অধিকারহারা, দুর্বল, নির্যাতিত মানুষকে রক্ষা করার জন্য আজ এমন একজন নেতার আবির্ভাব অপরিহার্য হয়ে উঠেছে যার হাত ধরে আবার পৃথিবীতে সত্যযুগ ফিরে আসবে। এই যুগের ফেরাউন, হামান ও তাদের সেনাবাহিনীকে আল্লাহ তাঁর প্রতাপ স্বচক্ষে দর্শন করাবেন। তিনি যে সর্বশক্তিমান, তিনি যে মহা পরাক্রমশালী, আজিজুল জাব্বার তা আবারও তিনি মানবজাতির সামনে প্রকাশ করবেন। তাঁর সেই শক্তির প্রকাশ তিনি ঘটাবেন তাঁরই নির্বাচিত কোনো মানুষের মাধ্যমে যিনি মানুষকে তাঁর হুকুমের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ করবেন এবং সেই ঐক্যের শক্তিকে কাজে লাগিয়ে প্রবল সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়বেন। সকল বিভেদের প্রাচীর তিনি চূর্ণ করে সমগ্র মানবজাতিকে এক পতাকাতলে সমবেত করবেন। সেই পতাকা সত্যের পতাকা। সেই পতাকা আল্লাহর সার্বভৌমত্বের পতাকা। কবি নজরুলের ভাষায়,

"ভবিষ্যৎ তাহার জন্য প্রস্তুত হইতেছে! সেই রুদ্র আসিতেছেন, যিনি ধর্ম-মাতালদের আড্ডা ওই মন্দির-মসজিদ-গির্জা ভাঙিয়া সকল মানুষকে এক আকাশের গম্বুজ-তলে লইয়া আসিবেন।"
(প্রবন্ধ- মসজিদ ও মন্দির)

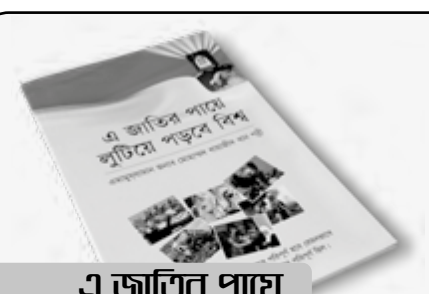

এ জাতির পায়ে লুটিয়ে পড়বে বিশ্ব

রসুলাল্লাহ (সা.) এর আহ্বানে সাড়া দিয়ে অবহেলিত, উপেক্ষিত, পশ্চাৎপদ আরব জাতি জ্ঞান-বিজ্ঞান, অর্থনীতি, সামরিক শক্তিসহ সকল বিষয়ে বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম জাতিতে পরিণত হয়েছিল। অনুরূপভাবে আজ বহুবিধ সমস্যায় জর্জরিত ষোল কোটি বাঙালিকে হেযবুত তওহীদ আহ্বান করছে, যদি কলেমা-তওহীদে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার একটি মাত্র শর্ত পূরণ করা হয় তবে এ জাতির পায়ে লুটিয়ে পড়বে বিশ্ব।

তওহীদ প্রকাশন
: 01670174643 | 01711005025

কোর'আন খতম ও তারাবিকেন্দ্রিক ধর্মব্যবসা

আতাহার হোসাইন

ধর্ম থেকে ত্যাগের শিক্ষাগুলো বিদায় নিয়েছে বহু আগে। সত্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম তথা জেহাদ করতে জীবন ও সম্পদ দুটোই ত্যাগ করা লাগে। তাই জেহাদও পরিত্যাগ করা হয়েছে বহু আগেই। কিন্তু রসুলাল্লাহ ও তাঁর সাহাবিরা জেহাদ করেছেন, কোর'আন ভর্তি আছে জেহাদের হুকুম। তাই সত্যিকার জেহাদের বিকল্প হিসাবে হাদিস প্রচার করা হয়েছে, আত্মার বিরুদ্ধে জেহাদই বড় জেহাদ। এই জেহাদ করতে হলে জীবন-সম্পদ আর ত্যাগ করার দরকার পড়ছে না। আনুষ্ঠানিকতা, আনন্দ-উপভোগের ক্ষেত্রগুলোকে গুরুত্বপূর্ণ করে বাণিজ্যিক রূপ দিয়ে দেওয়া হয়েছে। যেমন দুটো ঈদ। ৬০/৭০ টাকা ফেতরা দিয়েই মানুষ সমাজের দরিদ্র মানুষের প্রতি তাদের ধর্মীয় দায়িত্ব পালন করতে পারছে আর নিজেরা লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করে ঈদ-আনন্দ উপভোগ করছে। দেশে কেনাকাটা করে না পোষালে বিদেশে গিয়ে কেনাকাটা করতে যায় বহু মানুষ। রমজান মাস মানে এখন আর আত্মসংযমের মাস নয়, বরং এ মাসে অধিকাংশ পরিবারে খাওয়াবাবদ ব্যয় বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। বাজারে দ্রব্যমূল্য আকাশচুম্বি হয়। এই মাসে খতম তারাবি পড়িয়ে হাফেজ সাহেবরা ভালো আয়-রোজগার করেন। ঈদুল আজহায় কোরবানি অর্থাৎ ত্যাগের নামে শুরু হয় বিত্ত প্রদর্শন আর গোশত খাওয়ার মহোৎসব। এগুলো ছাড়াও শবে বরাত, শবে মেরাজ ইত্যাদি দিবসগুলোও ধর্মীয় দিক থেকে অতি তাৎপর্যপূর্ণ বলে উপস্থাপন করা হয় এবং এই দিবসগুলোকে ঘিরে ওয়াজ মাহফিল, মিলাদ মাহফিল, বিভিন্ন ধরনের খানাপিনার আয়োজন ইত্যাদি বিবিধ কর্মসূচিকে ইবাদত হিসাবে উপস্থাপন করে ধর্মব্যবসার পথ সুগম করা হয়। আর বিভিন্ন পীরের অনুসারীদের বছরজুড়ে নানা ধরনের ওরস, দিবস পালনের তো কোনো শেষ নেই।

> *বর্তমানে খতম তারাবির ব্যাপক প্রচলন ঘটানো হয়েছে যার অন্যতম কারণ বাণিজ্যিক। এত বড় কথা কেন বলছি? কারণ প্রথমত আল্লাহর রসুল কখনও খতম তারাবি করেন নি, এটার নামও কোনোদিন শোনেন নি, হাদিসগ্রন্থে 'তারাবি' শব্দটিই নেই এটা নিয়ে সকল আলেমই একমত। তথাপি একে 'উত্তম বেদাত' হিসাবে সওমের অংশ হিসাবে দাঁড় করানো হয়েছে। কেন তা বিচার করার জন্য যে কারো সত্যনিষ্ঠ বিবেকই যথেষ্ট হবে। ইতোপূর্বে আমরা দেখেছি, আয়াত গোপন করা ও এর বিনিময় গ্রহণ করাকে আল্লাহ কী প্রকারে হারাম করেছেন এবং এমন কারো অনুসরণ করার আদেশ করেছেন যিনি বিনিময় গ্রহণ করেন না এবং সঠিক পথপ্রাপ্ত।*

বর্তমানে খতম তারাবির ব্যাপক প্রচলন ঘটানো হয়েছে যার অন্যতম কারণ বাণিজ্যিক। এত বড় কথা

কেন বলছি? কারণ প্রথমত আল্লাহর রসুল কখনও খতম তারাবি করেন নি, এটার নামও কোনোদিন শোনেন নি, হাদিসগ্রন্থে 'তারাবি' শব্দটিই নেই এটা নিয়ে সকল আলেমই একমত। তথাপি একে 'উত্তম বেদাত' হিসাবে সওমের অংশ হিসাবে দাঁড় করানো হয়েছে। কেন তা বিচার করার জন্য যে কারো সত্যনিষ্ঠ বিবেকই যথেষ্ট হবে। ইতোপূর্বে আমরা দেখেছি, আয়াত গোপন করা ও এর বিনিময় গ্রহণ করাকে আল্লাহ কী প্রকারে হারাম করেছেন এবং এমন কারো অনুসরণ করার আদেশ করেছেন যিনি বিনিময় গ্রহণ করেন না এবং সঠিক পথপ্রাপ্ত। এবার আমরা দেখব কোর'আন খতম ও খতম তারাবির বিনিময়গ্রহণ সম্পর্কে হাদিস ও ফতোয়ার গ্রন্থগুলোতে কী সিদ্ধান্ত পাওয়া যায়।

• বিনিময় গ্রহণ সম্পর্কে রসুলাল্লাহর (সা.) সিদ্ধান্ত

১. বিশিষ্ট সাহাবি আবদুর রহমান ইবনে শিবল (রা.) বলেন, আমি রসুলাল্লাহকে বলতে শুনেছি যে, তোমরা কোর'আন পড় তবে তাতে বাড়াবাড়ি করো না এবং তার প্রতি বিরূপ হয়ো না। কোর'আনের বিনিময় ভক্ষণ করো না এবং এর দ্বারা সম্পদ কামনা করো না।' জীবনের প্রতিটি বিষয়ের মতো কোর'আন পড়ার মধ্যেও রসুলাল্লাহ পরিমিতিবোধ বজায় রাখতে বলেছেন। কারণ দীর্ঘ সময় কোর'আন পাঠ করলে পাঠকারী ও শ্রোতা উভয়ের মধ্যেই বিরক্তিভাব বা ক্লান্তি বা অমনোযোগ চলে আসতে পারে যা কোর'আনের জন্য মর্যাদাহানিকর। তাই তিনি এই বাড়াবাড়িটা করতে নিষেধ করেছেন। পাশাপাশি কোর'আন পাঠের বিনিময় ভক্ষণ করতে, এমনকি মনে মনে সম্পদ কামনা করতেও নিষেধ করেছেন।

২. রসুলাল্লাহ (সা.) বলেছেন, যে কেউ কোর'আন পড়ে সে যেন তা দিয়ে আল্লাহর কাছে চায়। এরপর এমন কিছু মানুষ আসবে যারা কোর'আন পড়ে তার বিনিময় মানুষের কাছে চাইবে।

৩. অর্থের বিনিময়ে কোর'আন খতমের যে ধারা আমাদের সমাজে চালু হয়েছে সে বিষয়ে রসুলাল্লাহর একটি ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে। আনাস ইবনে মালিক (রা.) বলেন, একদিন আমরা একদল লোক এক স্থানে সমবেত ছিলাম। আমাদের মধ্যে আরব, অনারব, কৃষ্ণাঙ্গ ও শ্বেতাঙ্গ সকল শ্রেণির লোকই ছিল। এ অবস্থায় নবী করিম (সা.) আমাদের মধ্যে আগমন করে বললেন, "তোমরা সৌভাগ্য দ্বারা পরিবেষ্টিত রয়েছ। তোমরা আল্লাহর কেতাব তেলাওয়াত করে থাক। তোমাদের মধ্যে আল্লাহর রসুল বর্তমান রয়েছেন। অদূর ভবিষ্যতে মানুষের নিকট এইরূপ এক যুগ আসবে যখন তীরের ফলক বা দণ্ড যেরূপ সরল ও সোজা করা হয়, লোকেরা কোর'আন তেলাওয়াতকে ঠিক সেইরূপ সরল ও সোজা করবে। তারা দ্রুত তেলাওয়াত করে নিজেদের পারিশ্রমিক আদায় করবে এবং এর জন্য তাদের বিলম্ব সহ্য হবে না।

• বিনিময় গ্রহণ সম্পর্কে আসহাবে রসুলগণ ও তাবেয়ীনদের সিদ্ধান্ত

১. রসুলাল্লাহর সাহাবিরা তাই কখনোই কোর'আন পাঠ বা শিক্ষাদানের বিনিময় গ্রহণ করতেন না, একে আগুনের মতো ভয় করতেন। তারা সবসময় আশঙ্কায় থাকতেন যে কোনোভাবে ইসলামের কাজের বিনিময়ে সম্পদ গ্রহণ করে ফেলেন কিনা। কারণ তারা ইসলামের যাবতীয় কাজ করতেন আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। পার্থিব জীবনযাপনের চাহিদা মেটাতে তারা হালাল পথে পরিশ্রম করে রোজগার করতেন। এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। আব্দাল্লাহ ইবনে মা'কাল (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি এক রমজানে লোকদের নিয়ে তারাবি পড়ালেন। এরপর ঈদের দিন উবাইদুল্লাহ ইবনে জিয়াদ তাঁর কাছে এক জোড়া কাপড় এবং ৫০০ দিরহাম পাঠালেন। তখন তিনি কাপড় জোড়া এবং দিরহামগুলো এই বলে ফেরত দিলেন, আমরা কোর'আনের বিনিময় গ্রহণ করি না।

২. তাবেয়ী যাযান (রহ.) বলেন, যে ব্যক্তি কোর'আন পড়ে মানুষ থেকে এর বিনিময় গ্রহণ করে, সে যখন হাশরের মাঠে উঠবে তখন তার চেহারায় কোনো গোশত থাকবে না, শুধু হাড্ডি থাকবে।

• বিনিময় গ্রহণ সম্পর্কে ফকিহ ও ইমামদের সিদ্ধান্ত

এবার দেখা যাক ইসলামের বিশেষজ্ঞ ও ইমামগণ এই ব্যাপারে কী ফায়সালা দিয়েছেন। পূর্ববর্তী আলেম-ওলামাগণ এ বিষয়ে একমত যে, খতমে তারাবির বিনিময় দেওয়া-নেওয়া উভয়ই নাজায়েজ ও হারাম। হাদিয়া হিসেবে দিলেও জায়েজ হবে না।

১. হাকিমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.) বলেন, বিনিময় লেনদেন হয় এমন খতম তারাবি শরিয়তপরিপন্থী। এরূপ খতমের

দ্বারা সওয়াবের অংশীদার হওয়া যাবে না বরং গোনাহের কারণ হবে।

২. দারুল উলুম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠানটি উপমহাদেশে কোর'আন হেফজ করার ক্ষেত্রে বিরাট ভূমিকা পালন করছে। তাদের ফতোয়ার একটি গ্রহণযোগ্যতা আলেম সমাজে রয়েছে। এই দারুল উলুম কর্তৃক প্রদত্ত ফতোয়াতেও আমরা দেখি খতম তারাবির বিনিময়ে অর্থ গ্রহণ না-জায়েজ। হযরত মুফতি আজিজুর রহমান (রহ.) বলেন, বিনিময় গ্রহণ করে কোর'আন শরিফ তেলাওয়াত করা জায়েজ নেই। যাদের নিয়তে দেওয়া-নেওয়া আছে, তাও বিনিময়ের হুকুমে হবে। এমতাবস্থায় শুধু তারাবি আদায় করাই ভালো। বিনিময়ের কোর'আন তেলাওয়াত না শোনা উত্তম। কিয়ামুল লাইলের সওয়াব শুধু তারাবি পড়লেই অর্জন হয়ে যাবে।

৩. তারাবিতে কোর'আন পড়ার বিনিময় গ্রহণ করা জায়েজ নেই। দানকারী এবং গ্রহণকারী উভয়েই গোনাহগার হবে। যদি বিনিময়বিহীন কোর'আন শোনানোর মতো হাফেজ পাওয়া না যায়, তবে ছোট ছোট সুরা দিয়ে তারাবি পড়ে নেওয়াই উত্তম।

৪. দেওবন্দি আন্দোলনের অন্যতম কাণ্ডারি হযরত রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী (র.) স্বয়ং বলেছেন, তারাবিতে যে পবিত্র কোর'আন পড়ে এবং যে শোনে তাদের মধ্যে অর্থের বিনিময় হারাম। আমাদের দেশের অধিকাংশ কোর'আনে হাফেজগণই এই দারুল উলুম দেওবন্দের ভাবধারায় পরিচালিত কওমি মাদ্রাসার ছাত্র। তারা এই ফতোয়াগুলোর কতটুকু মূল্যায়ন করছেন?

৫. আহলে হাদিস মতাদর্শের একজন পুরোধা ব্যক্তিত্ব মাওলানা আব্দুল্লাহ অমৃতসরী লিখেছেন, বিনিময়ের মাধ্যমে তারাবিতে পবিত্র কোর'আন তিলাওয়াত করা বা বিনিময় নির্ধারণ করা সম্পূর্ণ হারাম। বরং এরূপ লোকের পেছনে তারাবিও হয় না।

৬. দারুল ইফতাহ ও দারুল উলুম দেওবন্দের ফতোয়া রয়েছে - যে হাফেজ সাহেব টাকার লোভে কোর'আন মজিদ শোনান তা শোনার চেয়ে যে সুরা তারাবি আদায় করে তার মুক্তাদি হওয়া ভাল। যদি পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কোর'আন শোনানো হয় তাহলে ইমামের সওয়াব হবে না, মুক্তাদিরও সওয়াব হবে না।

৭. বিনিময় দিয়ে কোর'আন খতম শুনে তারাবি আদায় করার চেয়ে সুরা তারাবি আদায় করাকেই অনেক আলেম আমলের দিক থেকে উত্তম বলে ঘোষণা করেছেন। শায়েখ মুফতি মুহাম্মদ শফি (রহ.) বলেছেন, "ছোট ছোট সুরা দিয়ে তারাবি পড়ে নিন। বিনিময় দিয়ে কোর'আন শুনবেন না। কারণ কোর'আন শোনানোর মাধ্যমে বিনিময় গ্রহণ করা জায়েজ নেই।

৮. বিনিময় নিয়ে তারাবি নামাজে ইমামতকারী ইমামের ব্যাপারে প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আল্লামা আব্দুর রহমান মোবারকপুরী (র.) বলেন, আমি বিনিময় নিয়ে নামাজ পড়ানোকে মাকরুহ মনে করি এবং আমার ভয় হয়, ওই সব লোকের নামাজ আবার পড়তে হবে কি না, যারা এমন ইমামের পেছনে নামাজ আদায় করেন। এরপর তিনি বলেন, আমার মত হলো, বিনিময় গ্রহণ করা যাবে না।

৯. হযরত খলিল আহমদ সাহারানপুরী (রহ.) বলেন, বিনিময় দিয়ে পবিত্র কোর'আন শোনা জায়েজ নয়। দানকারী এবং গ্রহণকারী উভয় গোনাহগার হবে।

১০. মুফতি কেফায়াতুল্লাহ (রহ.) বলেন, তারাবিতে পবিত্র কোর'আন শোনানোর বিনিময় গ্রহণ করা জায়েজ নেই।

১১. খেদমতের নামে নগদ টাকা বা কাপড়চোপড় ইত্যাদি দেওয়াও বিনিময়ের মধ্যে শামিল। বরং তা বিনিময় ধার্য করা থেকেও জঘন্য। কারণ তাতে দুটি গোনাহ একত্রিত হয়। একটি কোর'আনের বিনিময় গ্রহণের গোনাহ। দ্বিতীয়টি হলো, যে বিনিময় হচ্ছে তা না জানার গোনাহ।

১২. বিশিষ্ট বেরলভি মুফতি আমজাদ আলী কাদেরী আজমী এক ফতোয়ায় লেখেন, বর্তমানে অধিক প্রচলন দেখা যায়, হাফেজ সাহেবকে বিনিময় দিয়ে তারাবি পড়া হয়- যা জায়েজ নেই। দানকারী ও গ্রহণকারী উভয়ই গোনাহগার হয়। এটুকু নেব বা এটুকু দেবে- এটিই শুধু বিনিময় নয়। বরং যদি জানা থাকে যে এখানে কিছু পাওয়া যায়, যদিও তা নির্দিষ্ট নয়, তা নাজায়েজ। কারণ জানা থাকাও শর্তকৃতের মতো।

১৩. লা-মাজহাবিদের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আল্লামা আব্দুর রহমান মোবারকপুরী লেখেন, ইমাম আহদ ইবনে হাম্বল (রহ.)-এর কাছে বিনিময় নিয়ে তারাবি নামাজে ইমামতকারী ইমামের ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা

প্রার্থনা করি, সেরূপ ইমামের পেছনে কে বা কারা নামাজ আদায় করবে?

এই প্রবন্ধে আমরা কোর'আন, হাদিস ও প্রসিদ্ধ আলেমদের ফতোয়ার গ্রন্থ থেকে কিছু দলিল তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। এ সমস্ত দলিল ও যুক্তিপ্রমাণের আলোকে যেন মুসলিম উম্মাহ সঠিকভাবে চিন্তা করার পথ খুঁজে পায় সেটাই এ লেখার উদ্দেশ্য। ঈদসহ অন্যান্য ধর্মীয় দিবসগুলো নিয়ে ধর্মবাণিজ্য করার কারণে দিবসগুলোর গাম্ভীর্য, পবিত্রতা, মাহাত্ম্য আজকে পুরোপুরিই ম্লান হয়ে গেছে। এটা করা হয়েছে স্বার্থের কারণে। একদিকে যেমন পণ্য ব্যবসায়ীরা দিবসগুলোকে ব্যবসায়িক স্বার্থে কাজে লাগাচ্ছে অপরদিকে ধর্মব্যবসায়ীরাও একই কাজ করছে।

একটি প্রাণঘাতী ভুলের চর্চা দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে বলে সেটাকে অনন্তকাল চালিয়ে যেতে হবে এমন ধারণা থেকে আমাদের সবার বেরিয়ে আসা উচিত। ধর্মব্যবসা ধর্মের ধ্বংস ডেকে আনে, এই সরল কথাটি সকলেই জানেন ও বোঝেন। এখন প্রয়োজন ধর্মব্যবসার বিরুদ্ধে মুসলিম উম্মাহর ঐক্যবদ্ধ অবস্থান। তাহলেই আমরা আবার আমাদের হারানো গৌরবের দিন ফিরে পেতে পারি। মিথ্যার কালো পর্দাকে ছিন্ন করার পরেই সম্ভব হয় সত্যের আলোয় আলোকিত হওয়া।

লেখক, কলামিস্ট ও ব্লগার

বাস্তব জীবনে রোজার কোনো প্রভাব পড়ছে কি?

মো. মোখলেছুর রহমান

দাম বেড়ে যাওয়ায় নিম্ন আয়ের মানুষ ১০ টাকার প্যাকেটে সয়াবিন তেল কিনছেন।

ইসলামের প্রতিটি আমলের উদ্দেশ্য আমাদের পৃথিবীর জীবনকে উন্নত করা। একেকটি আমল আমাদেরকে একেক দিকে অগ্রসর ও সমৃদ্ধ করে তোলে যদি সেটাকে তার উদ্দেশ্য বুঝে সঠিক আকিদায় বাস্তবায়ন করা হয়। সওম বা রোজাও এমন একটি আমল যা প্রকৃতপক্ষে মো'মেনের চারিত্রিক উন্নতির একটি প্রশিক্ষণ, যার প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়বে আমাদের জীবনে, আমাদের সমাজে। সওম আমাদেরকে শিক্ষা দিবে সংযম। ষড়রিপুর হাত থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করার জন্য সওম হচ্ছে ঢালস্বরূপ। (জাবির রা. থেকে মুসনাদে আহমাদ: ১৪৬৬৯)

কিন্তু সওম যদি সঠিক আকিদায় করা না হয়, তাহলে তা অর্থহীন হয়ে যাবে। একটি প্রসিদ্ধ হাদিসে আল্লাহর রসুল বলেছেন, এমন একটা সময় আসবে যখন রোজাদারদের রোজা থেকে ক্ষুধা ও পিপাসা ব্যতীত আর কিছু অর্জিত হবে না। আর অনেক মানুষ রাত জেগে নামাজ আদায় করবে, কিন্তু তাদের রাত জাগাই সার হবে (অর্থাৎ নামাজ কবুল হবে না) (ইবনে মাজাহ, আহমাদ, তাবারানী, দারিমি, মেশকাত)। সরল কথায়, সওম হবে উপবাস আর তাহাজ্জুদ হবে ঘুম নষ্ট করা। সওমের উদ্দেশ্য অর্জিত হবে না অর্থাৎ তা সওম পালনকারীকে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ (অহংকার) ও মাৎসর্য্য (হিংসা) থেকে রক্ষা করতে পারবে না।

> *রসুলাল্লাহ (সা.) এবং সাহাবী ও তাবে-তাবেয়ীনদের যুগ থেকে শুরু করে সমগ্র সোনালি যুগে রমজান মাসে বাজার দর সবচেয়ে মন্দা যেত। বাজারে জিনিস পত্রের দাম থাকতো সব চেয়ে কম।*

এখনই সেই সময়। আমাদের সমাজে শিশু থেকে বৃদ্ধ কেউই পারতপক্ষে রমজান মাসের ফরজ সওম ভঙ্গ করে না। রোগীরাও পারতপক্ষে সওম ভাঙেন না, যদিও রোগীদেরকে আল্লাহ ছাড় দিয়েছেন। কিন্তু সেই সওম যে ফলপ্রসূ হচ্ছে না তার প্রমাণ বাস্তব সমাজের দিকে দৃষ্টি দিলেই আমরা দেখতে পাই। সওম তো আমাদের সংযম শিক্ষা দেওয়ার কথা। লোভ থেকে, মিথ্যাচার থেকে বিরত রাখার কথা। কথা হচ্ছে, এই সওম যদি আমাদেরকে সংযমী করতো তাহলে একটা মুসলিমপ্রধান দেশে কীভাবে সওমের মাসে খাদ্যদ্রব্যের দাম সারা বছরের চেয়ে বেশি হয়?

এটা ইতিহাস যে, রসুলাল্লাহ (সা.) এবং সাহাবী ও তাবে-তাবেয়ীনদের যুগ থেকে শুরু করে সমগ্র সোনালি যুগে রমজান মাসে বাজার দর সবচেয়ে মন্দা

যেত। বাজারে জিনিস পত্রের দাম থাকতো সব চেয়ে কম। কারণ ধনীগণ এ মাসে কেনা কাটা, খাওয়া দাওয়া করতেন কম। তারা নিজের জন্য ভোগ্যপণ্য কেনাকাটা না করে ঘুরে ঘুরে গরীব দুঃখীদের দান করতেন। স্বল্প ও সীমিত আয়ের লোকেরা যে খাবার ব্যয় বাহুল্য হবে মনে করে অন্য মাসে খেতে পারতো না। তারা রমজান মাসের মন্দা বাজারে তা কিনতে পারতো। কিন্তু বর্তমানে রমজান মাসে ধনীগণ খাদ্য বস্ত্র সব কিছুতেই বেশি ব্যয় করেন। তাদের বিত্তের আক্রমণে বাজারের হাল-হাকিকত হয় বেসামাল। একশ টাকার মাছ পাঁচ/ছয়শত টাকায় বিক্রি হয়। রমজান মাস আসার আগেই চাল, ডাল, আটা, চিনি, লবণ, পেঁয়াজ, রসুন, তেল ইত্যাদি নিত্যপ্রয়োজনীয় সব কিছুর মূল্যই ধাঁই ধাঁই করে বেড়ে চলে। এতে সীমিত ও স্বল্প আয়ের মানুষের অবস্থা রমজানে ত্রাহী ত্রাহী। অর্থাৎ প্রকৃত ইসলামের যুগের সম্পূর্ণ বিপরীত চিত্র। সংযমের কোনো চিহ্নই থাকে না, অন্য সময়ের চেয়ে খাওয়ার পরিমাণ ও ব্যয় বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। অথচ আল্লাহ বলেছেন, যারা কুফরী করেছে তারা ভোগ-বিলাসে লিপ্ত থাকে এবং পশুর মত আহার করে। তাদের ঠিকানা হল জাহান্নাম (সূরা মোহাম্মদ ১২)।

আইয়্যামে জাহেলিয়াতের ভোগবাদী সমাজ ইসলামের ছায়াতলে আসার পর কেমন পরিবর্তিত হয়েছিল সেটা ইতিহাস। যে সমাজে নারীকে ভোগ্যবস্তু মনে করা হতো, সেই সমাজে এমন নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যে একজন যুবতী নারী একাকী সারা দেহে অলঙ্কার পরিহিত অবস্থায় শত শত মাইল পথ যেতে পারত, তার মনে কোনো ক্ষতির আশঙ্কাও জাগত না। মানুষ নিজের উপার্জিত সম্পদ উট বোঝাই করে নিয়ে ঘুরত, গ্রহণ করার মতো লোক খুঁজে পেত না। শেষে মুসাফিরখানায় দান করে দিত। আদালতগুলোয় মাসের পর মাস কোনো অপরাধ সংক্রান্ত অভিযোগ আসতো না।

সওমের মাসে যদি সতিকার অর্থে সংযম থাকতো তাহলে মুসলিম বিশ্বে দারিদ্র্য থাকতো না। যারা অবস্থাসম্পন্ন তারা যদি সংযমী হতেন যে এই একটি মাস আমরা লোকদেখানো সংযম নয়, সত্যিকারভাবে সংযম করব; তাহলে যতটুকু তারা ব্যয় সংকোচন করছেন সেটা সমাজের মধ্যে উপচে পড়তো। পনেরো কোটি মুসলমানের মধ্যে পাঁচ কোটিও যদি সংযম করে, ক্ষুধার্তের কষ্ট উপলব্ধি করে সেই ভোগ্যবস্তু অন্যকে দান করত তাহলে জাতীয় সম্পদ এমনভাবে উপচে পড়ত নেওয়ার লোক খুঁজে পাওয়া যেত না। সেটাই হতো সওমের বাস্তব প্রতিফলন। যদি অন্যান্য মাসে ভোজ্য তেলের লিটার থাকতো দুশ টাকা, এই মাসে থাকতো পঞ্চাশ টাকা। অন্যান্য মাসে গোশত যদি থাকতো ছয়শ, টাকা এই মাসে থাকতো দুশ টাকা। কারণ মানুষ নিজেদেরকে নিয়ন্ত্রণ করছে, চাহিদা থাকলেও খাচ্ছে না। ফলে দ্রব্যমূল্য হ্রাস পাবে। যে এগারো মাস ঘুষ খায় সে যদি এই একটি মাসে না খায় তাহলে তার একটি বিরাট প্রভাব সমাজে পড়ার কথা। কিন্তু বাস্তবে আমরা উল্টোটাই দেখি। এই মাসটিকে ব্যবসায়ীরা বাড়তি উপার্জনের মাস হিসাবে নির্বাচন করে। খাদ্যে আরো বেশি বিষাক্ত রাসায়নিক মেশানো হয়। টাকার জন্য মানুষ মানুষকে বিষ খাওয়াচ্ছে, সংযম তো দূরের কথা।

কথা ছিল, সংযম ও আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রভাব মানুষের শরীরের মধ্যে পড়বে, মনের মধ্যে পড়বে। এতে একদিকে ব্যক্তি পরিশুদ্ধ হবে, অন্যদিকে সমাজ সমৃদ্ধ হবে। বাস্তবে যখন এর উল্টো ঘটছে তার দাঁড়াচ্ছে আমাদের সওম হচ্ছে না।

আইয়্যামে জাহেলিয়াতের ভোগবাদী সমাজ ইসলামের ছায়াতলে আসার পর কেমন পরিবর্তিত হয়েছিল সেটা ইতিহাস। যে সমাজে নারীকে ভোগ্যবস্তু মনে করা হতো, সেই সমাজে এমন নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যে একজন যুবতী নারী একাকী সারা দেহে অলঙ্কার পরিহিত অবস্থায় শত শত মাইল পথ যেতে পারত, তার মনে কোনো ক্ষতির আশঙ্কাও জাগত না। মানুষ নিজের উপার্জিত সম্পদ উট বোঝাই করে নিয়ে ঘুরত, গ্রহণ করার মতো লোক খুঁজে পেত না। শেষে মুসাফিরখানায় দান করে দিত। আদালতগুলোয় মাসের পর মাস কোনো অপরাধ সংক্রান্ত অভিযোগ আসতো না। ইসলাম প্রতিষ্ঠার পূর্বে আরবের গেফার গোত্রের পেশাই ছিল ডাকাতি। সেই গোত্রের মানুষ আবু যর (রা.) সত্যের পক্ষে আমৃত্যু লড়াই করে গেছেন এবং নিজের গোত্রকেও ন্যায় প্রতিষ্ঠার যোদ্ধায় পরিণত করেছেন। রাস্তায় কেউ সম্পদ হারিয়ে ফেললে তা অবশ্যই ফেরত পাওয়া যেত। মানুষ স্বর্ণালঙ্কারের দোকান খোলা রেখেই মসজিদে চলে যেত, কেউ চুরি করত না। মানুষ জীবন গেলেও মিথ্যা বলত না, ওজনে কম দিত না। এই যে শান্তিপূর্ণ অবস্থা কায়েম হয়েছিল এটা কেবল আইন-কানুন দিয়ে হয় নি। মানুষের আত্মায় পরিবর্তন না আনতে পারলে কঠোর আইন দিয়ে চরিত্র ও মূল্যবোধ সৃষ্টি করা যায় না।

যে সমাজের মানুষগুলো কিছুদিন আগেও ছিল চরম অসৎ তাদের আত্মায় এমন পরিবর্তন আনা কী করে সম্ভব হয়েছিল? সেটা হচ্ছে এই সালাত, সওম ইত্যাদি চারিত্রিক প্রশিক্ষণের প্রভাব।

• সেই সালাত, সওম তো আজও কম হচ্ছে না, তাহলে এর ফল নেই কেন?

তার প্রথম কারণ - সওম রাখার প্রথম শর্ত হচ্ছে তাকে মো'মেন হতে হবে। এই আদেশ মো'মেনের প্রতি। যে জাতি মো'মেন নয় তারা হাজার সওম পালন করলেও তা কাঙ্ক্ষিত ফল দেবে না। কিন্তু এই জাতি মো'মেন না। আল্লাহ বলেছেন, তারাই মো'মেন যারা আল্লাহ ও রাসুলের উপর ঈমান আনে, কোনো সন্দেহ পোষণ করে না এবং সম্পদ ও জীবন দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করে। তারাই সত্যনিষ্ঠ মো'মেন (সুরা হুজরাত ১৫)। এই সংজ্ঞা যে পূর্ণ করবে সে মো'মেন। আমরা সংজ্ঞায় দুটি বিষয় পেলাম।

এক, আল্লাহ ও রাসুলের প্রতি ঈমান অর্থাৎ আল্লাহর সার্বভৌমত্বকে মেনে নেওয়া। যে বিষয়ে আল্লাহ ও রসুলের কোনো হুকুম-বিধান, আদেশ-নিষেধ আছে সেখানে আর কারো হুকুম মানা যাবে না - এই কথার উপর সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত ও দণ্ডায়মান হওয়া। বর্তমানের মুসলিম জনগোষ্ঠী আল্লাহর হুকুমের পরিবর্তে পাশ্চাত্য সভ্যতার হুকুম বিধানকেই তাদের জাতীয় ও সামষ্টিক জীবনে গ্রহণ করে নিয়েছে। সুতরাং তারা তওহীদে নেই। তারা মোমেন হওয়ার প্রথম শর্তটি পূরণ করেনি।

সওমের কোনো প্রভাব সমাজে কেন পড়ছে না তার দ্বিতীয় কারণ হলো, জাতির মধ্যে তাকওয়া, সত্যমিথ্যা, ন্যায়-অন্যায় বোধের সৃষ্টি করা হয়নি। আজকে অন্যান্য জাতির কথা বাদই দিলাম আমাদের মুসলমানদের মধ্যে ন্যায়-অন্যায় বোধের কোনো চিহ্ন নেই। স্বার্থই হয়ে দাঁড়িয়েছে ন্যায়-অন্যায়ের মানদণ্ড।

দুই, তওহীদে আসার পর আল্লাহর এই হুকুম-বিধানকে এই পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠার জন্যে সর্বাত্মক সংগ্রাম (জেহাদ) করতে হবে। তার জীবন-সম্পদ মানবতার কল্যাণে উৎসর্গ করতে হবে। এই মো'মেনের জন্যই হলো সওম, সালাহ, হজ্ব সবকিছু। এই জাতি এই সংজ্ঞার আলোকে মো'মেন নয়। তারা দ্বিতীয় শর্তটিও পুরণ করছে না।

সওমের কোনো প্রভাব সমাজে কেন পড়ছে না তার দ্বিতীয় কারণ হলো, জাতির মধ্যে তাকওয়া, সত্যমিথ্যা, ন্যায়-অন্যায় বোধের সৃষ্টি করা হয়নি। আজকে অন্যান্য জাতির কথা বাদই দিলাম আমাদের মুসলমানদের মধ্যে ন্যায়-অন্যায় বোধের কোনো চিহ্ন নেই। স্বার্থই হয়ে দাঁড়িয়েছে ন্যায়-অন্যায়ের মানদণ্ড। এ বিষয়গুলো আজকে আমাদেরকে অবশ্যই বুঝতে হবে, ভাবতে হবে। ভাবতে হবে এই জন্য যে আমরা মুসলমান ১৮০ কোটি। একের পর এক যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়ে সাম্রাজ্যবাদীরা মুসলিম দেশগুলোকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। আমরা জাঁকজমকপূর্ণ প্রাসাদোপম মসজিদ বানাচ্ছি, আমাদের সওম পালনকারীর (রোজাদার) কোনো অভাব নাই, হাজীর হজ্বের কমতি নেই, নামাজের কোনো অভাব নাই। কিন্তু ন্যায় অন্যায় বোধ এ জাতির মধ্যে নেই। এতেই বোঝা যায় আমাদের সালাত-সওমসহ অন্যান্য আমল কতটুকু গৃহীত হচ্ছে।

মুসলিম বিশ্বে রমজানের মাস আসতে না আসতেই দামী দামী পোশাক কেনা শুরু হয়। কথা ছিল এ মাসে আমি পোশাক কিনব গরীব মানুষের জন্য, সে হিন্দু হোক বা মুসলিম। কিন্তু কোথায় কী? যেখানে ইরাক-সিরিয়ার মুসলমানরা উদ্বাস্তু হয়ে অভাবের তাড়নায় ইউরোপের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করছে সেখানে অন্যান্য মুসলিম দেশগুলোতে চলে ইফতার আর ঈদের নামে খাদ্য ও সম্পদের বিপুল অপচয়। সওম তাদেরকে কোনো সংযম, আত্মনিয়ন্ত্রণ, কোনো সহমর্মিতাবোধ শিক্ষা দিচ্ছে না। এভাবেই তাদের সওম তার প্রকৃত সার্থকতা না পেয়ে উপবাসে পর্যবসিত হচ্ছে। এভাবেই রসুলাল্লাহর ভবিষ্যদ্বাণী আজ সত্যে পরিণত হচ্ছে।

লেখক: সহকারী সাহিত্য সম্পাদক, দৈনিক বজ্রশক্তি

সাস্থ্যসম্মত ইফতার করুন প্রাণবন্ত থাকুন

রমজানকে কেন্দ্র করে বাজারে ইফতারের জন্য মুখরোচক খাবারেরর আয়োজন করা হয়। এসবের বেশিরভাগই তেলে ভাজা বিভিন্ন ভারী খাবার। আবার বাসায় তৈরি ইফতারেও প্রধান্য থাকে ভাজা-পোড়ায়। চিকিৎসকদের মতে সারাদিন রোজা রাখার পর রোজাদার যদি এসব ভাজাপোড়া, তেল মসলা ও চর্বিযুক্ত খাবার গ্রহণ করেন তাহলে এর ফলে হার্ট ও কিডনির ক্ষতি হয়। এসব থেকে মুক্ত থাকতে চাইলে অস্বাস্থ্যকর খাবার বর্জন করে স্বাস্থ্যসম্মত ও পুষ্টিকর খাবার খাওয়ার পরামর্শ বিশেষজ্ঞদের। আর শরীরে সারাদিনের পানির ঘাটতি পূরণ করতে টকদই, ফলের রস, ডাবের পানি পান করা খুবই ভালো। তাই এবারের ইফতারে আমি রমজান মাসে শরীরের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানগুলো দিয়ে সহজ দুটি আইটেমের রেসিপি আপনাদের সাথে শেয়ার করব।

রেসিপি ০১: দই চিড়া

সবাই কমবেশি জানেন, দই-চিড়া খেলে পেট ঠান্ডা থাকে এবং চিড়া পানির অভাব পূরণ করে। দই চিড়ায় ব্যবহার করা হয় বিভিন্ন রকমের মিষ্টি ফল। তাই সারাদিন রোজা রাখার পর ইফতারে এ খাবারটি খেলে শরীর নানাভাবে উপকৃত হয়ে থাকে। চলুন তবে জেনে নেওয়া যাক, সুস্বাদুভাবে দই-চিড়া তৈরি করার রেসেপি।

পরিমাণ:

- *২ জন*
- *১/২ লিটার ঘন দুধ*
- *টক দই ১০০ গ্রাম*
- *কলা ১ টি*
- *ভেজা চিড়া ১/২ কাপ*
- *নারকেল কোড়ানো আধা কাপ*
- *পাকা আমের টুকরো (অপমনাল)*
- *কিসমিস ৪-৫টি*
- *লবণ স্বাদ মতো*
- *চিনি স্বাদ মতো*

প্রস্তুত প্রণালী:

প্রথমে চিড়া ধুয়ে পানি ঝরিয়ে নিতে হবে। এরপর বাটিতে টকদই, চিনি ও লবণ দিয়ে ভালোভাবে ফেটে নিতে হবে। তারপর মেশাতে হবে পরিমাণ মতো ঘন দুধ। আবারো ভালোমতো ফেটে নিতে হবে। এবার ফেটানো দইয়ে চিড়া মেখে ফ্রিজে রাখুন। ইফতারের ঠিক আগ মুহূর্তে ফ্রিজ থেকে বের কওে কিউব করে কেটে রাখা কলা, আম ও ধুঁয়ে রাখা কিসমিস ভালোভাবে মিশিয়ে পরিবেশন করুন।

রেসিপি ০২: ফ্রাইড ভেজিটেবল রাইস

খুব সাধারণভাবে অল্প উপকরণ দিয়ে এই ভাত ভাজা তৈরী করা যায়। এতে আছে প্রচুর ভিটামিন ও অন্যান্য পুষ্টি উপাদান। ধনে পাতা, পেঁয়াজ ও রঙিন সবজি থেকে অ্যান্টি অক্সিডেন্টের পাশাপাশি ভিটামিন ও মিনারেল পাওয়া যাবে। যা রমজানে শরীরের জন্য খুব উপকারী।

পরিমাণ:

- *৪ জনের*
- *৪ কাপ রান্না ভাত*
- *১টি বড়ো পেঁয়াজ কুচি*
- *স্বাদ মতো কাঁচা মরিচ*
- *৩/৪ টি রসুনের কোয়া*
- *১/২ চা চামচ হলুদ গুঁড়ো*
- *১ চা চামচ জিরা গুঁড়ো*
- *সবজি: বাঁধা কপি, ফুল কপি, শিম, বরবটি, পিয়াজ কলি, টমেটো (পছন্দ মতো যেকোনো দুইটি সবজি দিয়েই করতে পারেন)*
- *১টি মাঝারি সাইজের গাজর কুচি*
- *১/৪ ক্যাপ্সিকাম কুচি*
- *২টি আলু লম্বা করে কুচি করা*
- *২টি ডিম*
- *স্বাদমতো নুন*
- *১ প্যাকেট ম্যাগি মসালা*
- *পরিমাণ মতো সাদা তেল*
- *ধনেপাতা (অপশনাল)*

পদ্ধতি:

প্রথমে চালগুলো ৭০% সিদ্ধ করে নিন। চাল সিদ্ধ করার সময় এর মধ্যে ৩-৪ ফোটা তেল ও ১ চা-চামচ লবন দিন। সিদ্ধ হয়ে গেলে ভাতগুলো একটি পাত্রে নিয়ে ঠান্ডা করুন। এরপর ধুয়ে রাখা সবজিগুলো ছোট ছোট করে কেটে নিন। এবার চুলায় একটি হাড়ি বসিয়ে পরিমাণ মতো তেল দিন। তারপর ২ টি ডিমের ঝুরি ভাজা করে অন্য একটি পাত্রে উঠিয়ে রাখুন।

এবার বাকি তেলে কেটে রাখা পেয়াঁজ, রসূন, কাঁচামরিচ ভেজে নিন। তারপর হালকা ব্রাউন কালার হয়ে গেলেই এতে হাফ কাপ পরিমাণ পানি মিশিয়ে গুড়ো মশলাগুলো ও স্বাদমত লবন দিয়ে কষিয়ে নিন পানি শুকিয়ে আসার আগ পর্যন্ত। এবার কেটে রাখা সবজিগুলো দিয়ে ভালো মতো নাড়ুন। সবজিগুলো হালকা সিদ্ধ হয়ে গেলে এ পর্যায়ে ভাতগুলো ঢেলে দিন এবং নাড়তে থাকুন। এরপর ১০ মিনিটের জন্য হালকা আঁচে ঢেকে রাকুন। ১০ মিনিট পর শুরুতেই ভেজে রাখা ডিমের ঝুরি দিয়ে ভালোভাবে নাড়িয়ে, ঘ্রাণের জন্য ধনেপাতা কুচি (অপশনাল) দিয়ে নামিয়ে ফেলুন। ব্যাস রেডি হয়ে গেলো গরম গরম হেলদি ফাইড ভেজিটেবল রাইস। তাই সারাদিন খালিপেটে থাকার পর ইফতারিতে ভাজা-পোড়া খাবার খেয়ে এসিডিটি, বদহজম না বাড়িয়ে যতদূর সম্ভব স্বাস্থ্যকর খাবার খাই ও সুস্থ্য এবং প্রাণবন্ত থাকি পুরো রমজান মাস জুড়ে।

ভিজিট করুন

facebook.com/
emamht